দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

যোগ্য ও দায়বদ্ধসম্পন্ন দলই রাজ্যকে সুশাসন দিতে পারে
— পৃ: ১১

৭৩ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ১৫ মার্চ ২০২১।। ১ চৈত্র - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২ ।। website : www.eswastika.com

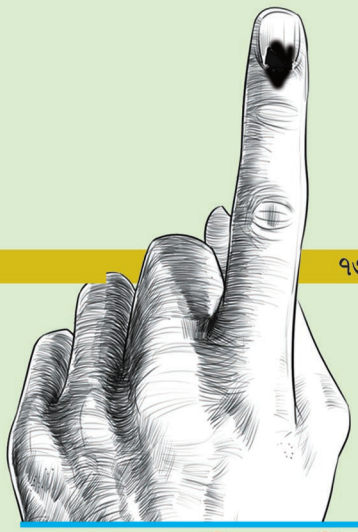

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন - ২০২১

- প্রথম দফা।। ২৭ মার্চ।। ৩০ আসন
- দ্বিতীয় দফা।। ১ এপ্রিল।। ৩০ আসন
- তৃতীয় দফা।। ৬ এপ্রিল।। ৩১ আসন
- চতুর্থ দফা।। ১০ এপ্রিল।। ৪৪ আসন
- পঞ্চম দফা।। ১৭ এপ্রিল।। ৪৫ আসন
- ষষ্ঠ দফা।। ২২ এপ্রিল।। ৪৩ আসন
- সপ্তম দফা।। ২৬ এপ্রিল।। ৩৬ আসন
- অষ্টম দফা।। ২৯ এপ্রিল।। ৩৫ আসন

মোট আসন
২৯৪

পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় ভোট

শাসকদল এত আতঙ্কিত কেন?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ১ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১৫ মার্চ - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে কট্টর মৌলবাদের শরণে বিলুপ্তপ্রায় কমিউনিস্টরা ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

সুন্দর মৌলিকের চিঠি : আব্বাসের ব্রিগেডে কংগ্রেস-সিপিএম ▯ ৭

বাঙ্গলায় রামনাম কীভাবে যুদ্ধের ডাক হয়ে উঠল ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ৮

যোগ্য ও দায়বদ্ধসম্পন্ন দলই রাজ্যকে সুশাসন দিতে পারে ▯ ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী ▯ ১১

বাঙ্গালিরা সচেতন না হলে বাংলা ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা পাবে না ▯ স্নেহাংশু মজুমদার ▯ ১৩

বাংলা ধ্রুপদীভাষার মর্যদা পেলে বাঙ্গালির ইতিহাস পূর্ণতা পাবে ▯ স্বর্ণাভ মিত্র ▯ ১৬

মাননীয়া ভেবেছিলেন ফাউল করলেও রেফারি বাঁশি বাজাবে না ▯ সুজিত রায় ▯ ২৩

পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় নির্বাচন : শাসকদল এত আতঙ্কিত কেন? ▯ বিমল শঙ্কর নন্দ ▯ ২৬

সত্য ও শাশ্বতের প্রতীক দেবাদিদেব মহাদেব ▯ রামানুজ গোস্বামী ▯ ৩১

দেবভাষা বাংলা, এবার ধ্রুপদী ভাষা হোক ▯ স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী ▯ ৩৫

বিচার ব্যবস্থা কলঙ্কিত, কাটজুর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিক কেন্দ্র ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৭

বামপন্থী কবির সেকুলারি ট্যুইস্ট এবং লিকার চা ▯ কল্যাণ গৌতম ▯ ৪৩

নারীমুক্তির দিশারি শ্রীরামকৃষ্ণ ▯ স্বামী ত্যাগিবরানন্দ ▯ ৪৪

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ ▯ ইন্দুমতী কাটদরে ▯ ৪৬

পরমেশ্বরণজী চিরদিন স্বয়ংসেবকদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবেন ▯ জে নন্দকুমার ▯ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **খেলা : ২৯** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩০** ▯ **চিত্রকথা : ৪২** ▯ **শব্দরূপ : ৫০**

প্রকাশিত হবে
২২ মার্চ
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২২ মার্চ
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দোল সাহিত্য, ২০২১

আবার এসে গেল রঙের উৎসব। গত বছর করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে সব উৎসবই ছিল বিবর্ণ। তাই এবছর প্রকৃতি কোথাও কোনও খামতি রাখেনি। বাঙ্গালিও মুখিয়ে আছে সবার রঙে রং মেলাতে। প্রতি বছরের মতো এবারও দোল উপলক্ষ্যে স্বস্তিকা পাঠকদের উপহার দিতে চলেছে বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা। থাকছে গল্প, প্রবন্ধ এবং দোল নিয়ে লেখা বিশেষ কয়েকটি রচনা।

লিখবেন— প্রবাল চক্রবর্তী, অভিজিত দাশগুপ্ত, নন্দলাল ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ সিংহ, পার্থসারথী গুহ এবং সন্দীপ চক্রবর্তী

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আট দফায় ভোটে রাজ্য সরকারের উষ্মা কেন?

ভারতের নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-সহ অসম, তামিলনাড়ু, কেরল ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল পুদুচেরীর বিধান সভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করিয়াছে। কেরল, পুদুচেরী, তামিলনাড়ুতে এক দফায় এবং অসমে তিন দফায় ভোট হইলেও পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত লইয়াছে নির্বাচন কমিশন। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি-সহ রাজ্যবাসীও যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছে। কারণ হইল, বিগত বহু বৎসর যাবৎ রাজ্যবাসী স্বাধীনভাবে তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। তাহাদের আশা, নির্বাচন কমিশনের সঠিক সিদ্ধান্তে এইবার তাহারা স্বাধীন ভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন। এইজন্য নির্বাচন কমিশনকে সবাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। ভোটকর্মীরাও নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের এই আট দফায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত রাজ্যের শাসকদল তথা তৃণমূল নেত্রী সহজভাবে মানিয়া লইতে পারেন নাই। নির্বাচন কমিশনর মতো একটি স্বশাসিত সংস্থার প্রতি তিনি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলিয়াছেন। বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অঙ্গুলিহেলনেই নাকি নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত লইয়াছে। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরীতে এক দফায় এবং অসমে তিন দফায় ভোট হইলে পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় কেন?

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পিছনে তৃণমূল নেত্রী রাজনৈতিক অভিসন্ধি খুঁজিয়া পাওয়ায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিস্মিত হইয়াছেন। তৃণমূল নেত্রী ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন তিনিও এই রাজ্যে একাধিক দফায় ভোট গ্রহণের দাবি জানাইয়াছিলেন। কেননা, বাম আমলে নির্বাচনের দিন বাম নেতা ও তাহাদের হার্মাদরা গোটা রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ নির্মাণ করিয়া অবাধে ভোট লুঠ করিত। ২০১১ সালে নির্বাচন কমিশন ছয় দফায়, কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারিতে রাজ্যবাসীকে স্বাধীন ভাবে ভোটদানের সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। ফলস্বরূপ, বাম অপশাসনের অবসান হইয়া তৃণমূলনেত্রী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ২০১১ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বামেদের সেই জঙ্গলের রাজত্ব শুধু ফিরাইয়াই আনেন নাই , বামেদের চাইতে বহুগুণে রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক পরিবেশকে কলুষিত করিয়া রাজ্যটিকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামাঞ্চলের ৩৪ শতাংশ মানুষকে স্বাধীন ভাবে ভোটাধিকারে বাধা দিয়াছে শাসকদলের নেতা-কর্মী-গুন্ডারা। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির ১৩৬ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হইয়াছে। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা একাধিক বার রাজ্য পরিদর্শন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ভয়ানক ভাবে অবনতি হইয়াছে। সর্বত্র হিংসার পরিবেশ রহিয়াছে। সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া,অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তাহারা আট দফায় দিনক্ষণ ঘোষণা করিয়াছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও রাজনৈতিক হিংসার কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে, কেন্দ্রীয় বাহিনী বিভিন্ন বুথে মোতায়েনের সুবিধার্থে তাহাদের আট দফায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত লইতে হইয়াছে।

বস্তুত, আট দফায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্তে তৃণমূল নেত্রীর উষ্মা প্রকাশে তাঁহার আসল রূপটি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বলিয়া কিছুই নাই। সমগ্র দেশের সম্মুখেও পশ্চিমবঙ্গের অন্তঃসারশূন্য রূপটি ধরা পড়িয়াছে। ইহা পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে খুবই লজ্জার বিষয়। আসন্ন বিধানসভা ভোটে স্বাধীন ভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিলেই এই লজ্জা হইতে উত্তরণের পথ পাওয়া যাইবে। নির্বাচন কমিশন রাজ্যবাসীকে সেই সুযোগটিই করিয়া দিয়াছে।

সুভাষিতম্

প্রত্যহং প্রত্যবেক্ষেত নরশ্চরিতমাত্মনঃ।

কিং নু মে পশুভিস্তুলং কিং নু সৎপুরুষৈরিতি।।

মানুষকে প্রতিদিন নিজের চরিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখা উচিত। কেননা আমি যেভাবে জীবনযাপন করছি, তা পশুর মতো না প্রকৃত মানুষের মতো?

চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে
কট্টর মৌলবাদের শরণে বিলুপ্ত-প্রায় কমিউনিস্টরা

বিশ্বামিত্র

পরপর দুই রবিবার দুটি ব্রিগেড দেখলো জনতা। দেখলো দুই ব্রিগেডের দুই ভিন্নমুখী চরিত্র। প্রথম রবিবার যদি হয় সাম্প্রদায়িক-শক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া, তো দ্বিতীয় সোনার বাঙ্গলা গঠনের অঙ্গীকার। ২৮ ফেব্রুয়ারির সিপিএম-কংগ্রেস- আইএসএফের যৌথমঞ্চের ব্রিগেড দেখার পর অনেকেই যারপরনাই আশ্চর্য হয়েছেন। তাদের বিস্ময়ের মূল কারণ হলো, যে সিপিএম মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বুলি সদাসর্বদা ঝুলিয়ে রাখে তারা কীভাবে ফুরফুরা-শরিফের এক পিরজাদার কাছে আত্মসমর্পণ করল! আসলে এই প্রশ্ন যারা করছেন, তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ তো আমাদের আত্মবিস্মৃত জাতির, আমাদের ইতিহাসবোধের অভাবের। নইলে কমিউনিস্টদের দেশভাগের সময়ে পাকিস্তানের হয়ে দালালি, দেশ-বিভাজন পরবর্তী সময়ে চীনের হয়ে দালালি, দেশের স্বাধীনতার সময়ে নেতাজীকে তেজোর কুকুর, রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি, বিবেকানন্দকে বেকার যুবক বলা, স্বাধীনতার পর রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা—কমিউনিস্টদের দুষ্কর্মের লম্বা ফিরিস্তি দেওয়ার জায়গা এটা নয়। আমার শুধু বলার বিষয়, যাদের বিশ্বাসঘাতকতার এই পর্বত প্রমাণ ইতিহাস, তাদেরই ইতিহাস লেখার ভার দিয়েছি আমরা। যার ফল হয়েছে আচার্য যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের অপমান করে, গুপ্তকবির ভাষায় স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর পূজার মতো রোমিলা থ্যাপার, ইরফান হাবিব, বিপান চন্দ্রদের লেখা ইতিহাসকেই আমরা মূলধারার ইতিহাস বলে মেনে নিয়েছি। এরা যদি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বীর সাভারকরের মূল্যায়ন করে তবে ভারতের আধুনিক ইতিহাসের অবমূল্যায়ন তো ঘটবেই, উপরন্তু অবমাননাও হবে। বলাবাহুল্য, কমিউনিস্টদের সাম্প্রদায়িক সখ্যও সেই ইতিহাস-অবমাননার অংশবিশেষ।

কেন, সেটা খুলে বলা যাক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় তাসখণ্ডে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়। তিনি তার স্মৃতিকথায় স্বীকার করেছেন তাসখণ্ডে আসা কিছু মুহাজির ('মুহাজির' আসলে একটি উর্দু শব্দ, এর ডিকশনারি-গত অর্থ একটু আলাদা হলেও সাধারণত মুসলমান জেহাদি বোঝাতে এই শব্দটির ব্যবহার হয়)-যুবকদের উৎসাহে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে সিপিএমের প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমেদ, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিশক্তি ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের ওপর কীরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা বুঝতে পেরেই সম্ভবত নিজের আত্মজীবনী 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'তে শ্রীরায়ের এই ধরনের বিবৃতিকে অস্বীকার করে বলেছেন, তাসখণ্ডে আসা সেই মুহাজির-রা নয়, মানবেন্দ্রনাথই ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তৈরির আসল কারিগর। কিন্তু তিনিও তাসখণ্ডে মুহাজির-প্রভাবকে উড়িয়ে দিতে পারেননি। ইতিহাস বলছে, এরপর কমিউনিস্ট পার্টি আর কোনোদিনই জেহাদিদের প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি বা হতে চায়নি। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ দেয়, নানা কিসিমের কমিউনিস্ট পার্টির হিন্দু নেতারাও আসলে মুসলমান- স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছে। একদা মাওবাদী আদর্শের প্রতি আস্থাশীল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক একবার ক্লাসে পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন, স্বাধীনতার পর মুসলিম লিগ তো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেল, কিন্তু লিগের সাধারণ কর্মীরা একেবারে বসে গেল তা তো হতে পারে না। তারা কোথায় গেল? সেই অধ্যাপকের নিজস্ব রিসার্চ বলেছে, তারা কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল।

আমি অধ্যাপকের সেই রিসার্চ নিয়ে অনেকবার ভেবেছি। ১৯৭৭ সালে এরাজ্যে ক্ষমতায় জাঁকিয়ে বসার পর থেকেই বামেদের মুসলমান-ভোটে একচ্ছত্র অধিকার, ৪৭-এ দেশের খণ্ডিত স্বাধীনতার পর থেকে মুসলমান ভোটব্যাঙ্কে ধীরে ধীরে দখলে নেওয়া, কমিউনিস্ট আঁতেলদের সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা ইত্যাদি বড়ো বড়ো বুলি, এসব দেখার পর স্যারের কথাই ঠিক বলে মনে হয়েছে। সেদিনও গোটা ব্রিগেড দেখলো মঞ্চে আলিঙ্গন করে আব্বাস সিদ্দিকিকে মহম্মদ সেলিমের কী উষ্ণ অভ্যর্থনা। কে এই আব্বাস সিদ্দিকি? শরিয়তি আইনে আস্থা রাখা একজন কট্টর ধর্মগুরু, ইসলামি পরিভাষায় 'হুজুর' বলে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও তার বিভিন্ন ইসলামি কট্টর বক্তব্য, যেগুলি এখন ভাইরাল হয়েছে। আচমকা তিনি ভোটের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতে গেলেন কেন? এর পেছনে কমিউনিস্ট পার্টির চিত্রনাট্যের প্রবল প্রভাব থাকতেই পারে। ভেকধারী হয়ে সেকুলারিজমের জোব্বা পরে ভারতবাসীকে বোকা বানানোর দীর্ঘদিনের ট্র্যাডিশন কমিউনিস্টদের আছে। অতি আশ্চর্যের ব্যাপার, এক কট্টর 'হুজুর', কিছুদিন আগে পর্যন্ত হিন্দুদের 'হালাল' করাই ছিল যার একমাত্র লক্ষ্য তিনি জনগণকে বোকা বানাতে সেই কমিউনিস্টদের পেটেন্ট সেকুলারিজম অস্ত্রেই শান দিলেন আর সেটা কমিউনিস্টদের সঙ্গে করেই।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, কমিউনিস্টদের মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক ধস নামিয়েই মমতা পশ্চিমবঙ্গের জয় হাসিল করেছিলেন। কুটবুদ্ধিসম্পন্ন কমিউনিস্টদের মুসলমান-তোষণের অধিক তোষণ মমতা করলেও দুষ্টুবুদ্ধির অভাবে তা চেপে রাখতে পারেননি, বরং বেআব্রু হয়ে পড়েছে। ফলে ঘরপোড়া গোরু হিন্দুরা আবার দেশভাগের আশঙ্কা করছেন এবং স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার তাঁরা জোটবদ্ধ হচ্ছেন এবং সেই জোট ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলছে। এই অবস্থায় এরাজ্যে ৭ শতাংশে ঠেকা কমিউনিস্টরা আবার তাদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাবার জন্য কট্টর মৌলবাদেরই শরণ নিচ্ছে, তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে। সুতরাং হিন্দুদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। ◘

আব্বাসের ব্রিগেডে কংগ্রেস-সিপিএম

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা

নির্বাচন এসে গিয়েছে। এবার কঠিন দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। আর সেই দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল গত ২৮ ফেব্রুয়ারির ব্রিগেড সমাবেশের পরে। ধর্মীয় নেতা আব্বাসি সিদ্দিকি ব্রিগেড ভরালেন মুসলমানদের নিয়ে এসে। সেদিন বাম-কংগ্রেস জোটের ব্রিগেড সমাবেশের পিছনে তৃণমূলের সমর্থন রয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি। এটা ভুল কিছু নয়। এমনকী আগামীদিনে রাজ্য সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আব্বাস সিদ্দিকিকে তুলে ধরার চেষ্টাও তৃণমূল করতে পারে।

ভিড় দেখেই বোঝা গেছে, এটা বাম-কংগ্রেসের সমাবেশ ছিল না। এটা তৃণমূলের অনুপ্রেরণায় এবং মহম্মদ সেলিমের প্রযোজনায় ভাইজানের ব্রিগেড। সেই ব্রিগেডে কংগ্রেস আর সিপিএম যোগ দিয়েছে। অনেকেরই হয়তো মনে পড়ে যাবে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের কথা। এই রকমই সভায় গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর নায়ক সুরাবর্দির সঙ্গে শহিদ মিনার ময়দানে ছিলেন জ্যোতি বসু। সেদিনই শুরু হয়েছিল হিন্দু নিধন দাঙ্গা। এবার বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসুর উপস্থিতিতে মঞ্চে আব্বাস সিদ্দিকি। এতে প্রমাণ হলো কমিউনিস্টদের সেই পরম্পরা সমানে চলছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি থেকে তারা দূরে সরে আসতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ বজায় রেখেছে। আর এখানেই ভয়।

বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে বুঝেই এই জোট। মনে রাখতে হবে, এই জোটে রয়েছে তৃণমূলও। তাদের স্বার্থটাই বেশি। আব্বাস কয়েকটা আসন পেলে তাঁর সমর্থন নিয়ে সরকার গড়ার একটা শেষ চেষ্টা চালাবে তৃণমূল। প্রয়োজনে উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়তেও পিছপা হবে না। সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে এটা শিয়রে শমন।

ব্রিগেডের মঞ্চে আব্বাস নিজেই তোলেন ভিড় প্রসঙ্গ। বলেন, 'দুদিনের চেষ্টায় এত লোক। আরও এক সপ্তাহ আগে জোট চূড়ান্ত হলে এর দ্বিগুণ ভিড় করে দিতাম।' তিনি বক্তৃতা দেওয়ার পরেই মাঠ ফাঁকা হয়ে যায়। সেই ভিড়ের চেহারা আগেই বলে দিয়েছিল আর সভা শেষ হওয়ার পরে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে কারা এসেছিলেন ব্রিগেড ভরাতে। তাঁর দল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)। ব্রিগেডে জমায়েতে আব্বাসের সমর্থক ২৫-৩০ বছরের তরুণদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। ফুরফুরা শরিফের 'ভাইজান'কে নিয়ে উচ্ছ্বাস এমনই যে, মঞ্চে তাঁর প্রবেশের সময়ে মাঠের হইচইয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা থামিয়ে দিতে হয় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা অধীর চৌধুরীকে। তার আগে একবার সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রকেও।

জোটের কাছ থেকে হক বুঝে নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন আব্বাস। তাঁর সব শর্ত মানতে রাজি বামেরা। কংগ্রেসও সেই পথেই হাঁটছে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো অনেক আগেই বলে দিয়েছেন, যে গোরু দুধ দেয় তার লাথি খেতে তিনি তৈরি।

সুতরাং...

বাঙ্গলায় রামনাম কীভাবে যুদ্ধের ডাক হয়ে উঠল?

স্বপন দাশগুপ্ত

'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি মমতা ব্যানার্জি তাঁর যা কিছু রাজনৈতিক পুঁজির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তার বিরোধিতা করার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙ্গালি হিন্দু আজ সন্ত্রস্ত যে তারা হয়তো মমতা ব্যানার্জির ক্রমাগত সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণের ফলে ক্রমশ আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন স্মরণাতীতকালের মধ্যে একটি তিক্ততম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরা যুদ্ধের মাত্রা পেতে চলেছে। অতীতের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলির ক্ষেত্রে প্রধানত মাঠের সীমানার ধারে থাকা জৌলুসহীন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ থেকে আজকের শাসক তৃণমূল দলের চোখে চোখ রেখে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিরোধিতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তারই মূল প্রতিপক্ষ ও ২০২১-এর এই নির্বাচনী রণে অতীতের মহাশক্তিধর সিপিএম আজ প্রায় অকিঞ্চিৎকর বা স্থানে স্থানে কোনো কোনো মূল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কিছু ক্ষতি সাধন করা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা পালন করে না।

অবশ্যই এই নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় রাজনীতিকে প্রত্যক্ষভাবে কখনই প্রভাবিত করবে না। কিন্তু প্রাদেশিক দলগুলিকে নিজ নিজ রাজ্যে উজ্জীবিত করার সম্ভাবনা এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। ঠিক তামিলনাড়ুতে যেমন ১৯৬৭ সাল থেকেই শাসন ক্ষমতা পর্যায়ক্রমে প্রাদেশিক দলগুলির মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়, পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৭৭ থেকে স্থানীয় দলগুলিরই রমরমা। তত্ত্বগতভাবে সিপিএম প্রাদেশিকতার তকমা ঝেড়ে নিজেদের জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক দল বলতেও কসুর করে না। তারা ১৯৭৭ থেকে ২০১১ অবধি পশ্চিমবঙ্গ শাসন করেছে। বাস্তবে অবশ্য ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের পর সিপিএম কেবল মাত্র বাঙ্গালি চিন্তাভাবনা ও আবেগের প্রতিফলনের ওপর ভর করেই টিকে ছিল। ঠিক যে কারণে রাজ্যের প্রয়োজন ও মানসিকতা সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এক করে ফেলায়— ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসের তালমিল হচ্ছিল না। ঠিক এই কারণেই কংগ্রেসের জাতীয় অগ্রাধিকার ও রাজ্যের অগ্রাধিকারের সংঘাতেই ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হয়। এর মধ্যে কংগ্রেস বিরোধিতার প্রাণকেন্দ্র আবার স্বাভাবিক নিয়মে সর্বদাই কলকাতা-কেন্দ্রিক থেকে গেছে।

এই পরিমণ্ডলে বিজেপি দল ডবল ইঞ্জিন সরকার অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার থাকার যে প্রচার ও কর্মসূচি নিয়ে মানুষের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়েছে তাতে এই খামখেয়ালি মমতাদেবীকে যদি হটানো যায় সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অভিমুখ নতুন করে অন্য খাতে বইতে পারে। একই সঙ্গে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি দলের আধিপত্য আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

একটা জিনিস খেয়াল রাখা দরকার, এবারের এই নির্বাচনী লড়াই কেবলমাত্র তৃণমূল নেতৃত্বের রাজ্যের অর্থনীতি ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও সেই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্ব হারানো-কেন্দ্রিক নয়। যেমন নয় এই রাজ্য পরিচালনায় বিগত ১০ বছরে মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক রেকর্ড কতটা হতাশাব্যঞ্জক। বিষয়টা আরও ব্যাপক। মমতা ব্যানার্জি এই নির্বাচনী পরিসরটিকে বাঙ্গালির নিজস্ব পরিচয়, সংস্কৃতি, অস্মিতার সঙ্গে তাঁর কু-কল্পনায় গুজরাট থেকে আসা প্রাগৈতিহাসিক কোনো অতিমানবের সম্মুখসমর হিসেবে তুলে ধরছেন। একধাপ এগিয়ে তিনি স্লোগান দিয়েছেন 'জয় বাংলা' যা ১৯৭০-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের যুদ্ধ আহ্বান ছিল। তারা পাকিস্তানি নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এই ডাকের মাধ্যমে সকলকে একত্রিত করতেন। মমতা ব্যানার্জি বিজেপির তথা ভারতের গরিষ্ঠাংশ মানুষের এই সম্বোধনটিকে বাঙ্গালির কাছে অপরিচিত ও বিদেশি বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং মানুষের মধ্যে এই ডাকের প্রতি সম্ভ্রম এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। উত্তর ভারতে ১৯৮৮ সালে রামজন্মভূমি আন্দোলনের সময় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল এবং সেখানকার আপামর মানুষকে এই ধ্বনি যেভাবে উদ্বুদ্ধ করত তার প্রভাব কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তেমন একটা পড়েনি। হিন্দুদের এই যে জাতিসত্তার পুনরুত্থান সে সম্পর্কে আমাদের রাজ্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত থেকে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে স্লোগান বলতে ছিল 'ইনকিলাব জিন্দবাদ' কিংবা বন্দে মাতরম্, এই রাজ্যে

জয় শ্রীরাম একেবারে ছিল না। বাঙ্গলার তথাকথিত স্বঅর্পিত প্রগতিশীল তকমাধারী বুদ্ধিজীবীরা এই স্লোগানকে তাদের বর্ণিত উত্তর ভারতের নিকৃষ্ট গোবলয়ের মানুষদের আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক স্লোগান বলে মনে করত যা কিনা বাঙ্গালির উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পক্ষে আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না, একান্ত বেমানানও নাকি ছিল। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৮টি লোকসভা আসন দখল করার পর সেই মনোভাব কি বদলে গেল? রাজনৈতিক হিন্দুত্বের শিকড় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদীদের উত্থানের অনেক আগেই ছিল। সেই আদি জাতীয়তাবাদের উৎস ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্ এবং তাঁর চিরকালীন চিন্ময়ী ভারতমাতার রূপ কল্পনার প্রকাশে। যা একটা সময় দেবী দুর্গার আবাহনের মধ্যে এক মসৃণ ধারায় প্রবাহিত হয়ে যায়।

অন্যদিকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি উত্তর ভারতের লোককথার মধ্যে থেকে আহরিত হয়ে জনজীবনে মিশে গেলেও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের সেই সময়কার তুঙ্গী রাজনৈতিক দাপট বাঙ্গলায় রামের মুখের ওপর অনেকটা 'প্রবেশ নিষেধ' বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি করেছিল। এই সময়ই অযোধ্যা আন্দোলনে রামনামে দেশব্যাপী নতুন করে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এখন এই পূর্ব ইতিহাসের ভিত্তিতে বাঙ্গলায় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি অযোধ্যার মতোই এক উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে এমন একটি ভাবনা খুবই আকর্ষক হলেও পুরোপুরি সঠিক নয়। অন্যদিক থেকে বাঙ্গলায় এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে হিন্দু বাঙ্গালিরা

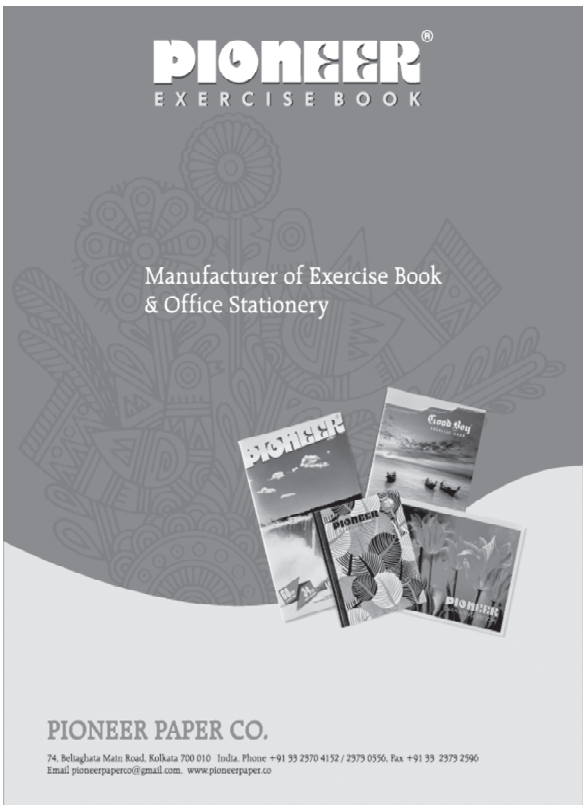

হঠাৎ করে তুমুল ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠেছে। অবশ্যই এখানে রামের জন্মদিন উপলক্ষ্যে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়া হয় কিন্তু এর বাইরে রামনামের প্রয়োগ নিশ্চিত ভাবে রাজনৈতিক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পশ্চিমবঙ্গে এই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তথাকথিত বিদগ্ধ বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের স্বনির্মিত নিজস্ব বলয়ের বাইরে থাকা প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠার মাত্রা পেয়েছে। অন্যদিকে জয় শ্রীরাম স্লোগানের মধ্যে একটি অপ্রতিরোধী আকর্ষণ ও ভালোবাসার সংমিশ্রণ হয়ে রয়েছে তা কেন মমতা ব্যানার্জিকে এতটা বিছুটি লেগে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা দিচ্ছে সেটিও পর্যালোচনার বিষয়। ২০১৯ সালে লোকসভার প্রচারের সময় তিনি এই স্লোগানকে গালাগালির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অতি সম্প্রতি একটি অত্যন্ত মহতী সভায় এই রামনাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়েন। একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান পর্যন্ত হারান এবং নিজের বক্তৃতা মধ্যপথে বন্ধ করে দেন। তিনি এটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপমান বলে মনে করেন। তাঁর এই মাত্রাজ্ঞানহীন প্রতিক্রিয়ার ফলে আজ 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি মমতা ব্যানার্জি তাঁর যা কিছু রাজনৈতিক পুঁজির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তার বিরোধিতা করার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙ্গালি হিন্দু আজ সন্ত্রস্ত যে তারা হয়তো মমতা ব্যানার্জির ক্রমাগত সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণের ফলে ক্রমশ আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে, কেননা তিনি প্রশাসক হিসেবে আদৌ সফল নন। আজ মনে হয় প্রাক স্বাধীনতা যুগে ইংরেজ বিরোধিতায় বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিলেই যেমন তারা উন্মত্ত হয়ে উঠত, ঠিক তেমনই জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনলেই একটি অংশের মধ্যে আক্রোশ ঘনিয়ে উঠছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পক্ষে এই ডাক আজ অশুভের বিরুদ্ধে শুভের লড়াইয়ের যে মাত্রা বিজেপি পৌঁছে দিয়েছে তা অত্যন্ত অশনি সংকেত। বাস্তবে তুলনামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের আজকে এমন একটি আকর্ষণীয় স্লোগানের প্রয়োজন। তারা পিছিয়ে পড়েছে, কেননা জয় শ্রীরাম ধ্বনি প্রচার করা অবশ্যই নিজেদের ন্যায়ের পক্ষধারী মনে করছে। রাজনীতির নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে নির্বাচনী রাজনীতিতে এই নীতিনিষ্ঠ অবস্থা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে। □

শোকসংবাদ

মালদহ নগরের পুড়াটুলী শাখার স্বয়ংসেবক মলয় গাঙ্গুলী গত ২ ফেব্রুয়ারি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও ২ ভাই রেখে গেছেন।

* * *

মেমারি নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন নগর সঙ্ঘচালক বিজয় চট্টোপাধ্যায় গত ৬ মার্চ পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

রম্যরচনা

ভবিষ্যৎ দৃষ্টি

একবার এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী রাজ্য পরিদর্শনে বের হয়ে প্রথমে তাঁরা একটি জেলখানায় গেলেন। জেলারকে বললেন, জেলের উন্নয়নের জন্য কত টাকা প্রয়োজন? জেলার বললেন সব ঠিক চলছে, কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। মুখ্যমন্ত্রী বললেন তবু বলুন। জেলার কিছুক্ষণ ভেবে বললেন পাঁচলক্ষ টাকা দিলেই হবে। এরপর তাঁরা একটি স্কুলে গেলেন। প্রধান শিক্ষককে মুখ্যমন্ত্রী বললেন স্কুলের উন্নয়নের জন্য কত টাকার প্রয়োজন? প্রধান শিক্ষক কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন স্কুলে কিছুই নেই, কমপক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার দরকার।

ফিরে এসে মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীকে বললেন জেলখানাকে পঞ্চাশ লক্ষ আর স্কুলকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবার ব্যবস্থা করুন। অর্থমন্ত্রী অবাক হয়ে এর কারণ জানতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী বললেন সে বুদ্ধি থাকলে তো আপনি মুখ্যমন্ত্রী হতেন। অর্থমন্ত্রী বললেন, মানে? মুখ্যমন্ত্রী হেসে বললেন দেখুন, ওই স্কুলে আপনি পড়তে যাবেন না আর আমিও যাব না। কিন্তু আমাদের তো জেলখানায় যেতে হতে পারে। তাই জেলখানার পরিবেশ যাতে আরামদায়ক থাকে, তার ব্যবস্থা করে রাখছি।

উবাচ

"পঁচিশ বছর পর দেশ যখন স্বাধীনতার শতবর্ষ পালন করবে, তখন পশ্চিমবঙ্গ যেন দেশের অগ্রগণ্য রাজ্যগুলির একটা হয়। ৭৫ বছরে বাঙ্গলার যা কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী
সম্প্রতি ব্রিগেডের বিশাল জনসভা থেকে

"ব্রিগেডের ঐতিহাসিক ভিড় প্রমাণ করল সোনার বাঙ্গলা তৈরির জন্য মানুষ আসল পরিবর্তন চাইছেন। এবার পশ্চিমবঙ্গকে নরেন্দ্র মাদীর হাতে তুলে দেবই।"

দিলীপ ঘাষ
রাজ্য বিজেপি সভাপতি
ব্রিগেডের জনসভায়

"শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে এই রাজ্যটি ইসলামিক দেশে পরিণত হতো। তিনি না থাকলে আমরা আজ বাংলাদেশ বাস করতাম। তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরলে পশ্চিমবঙ্গকে কাশ্মীরের পরিণত করবে।"

শুভেন্দু অধিকারী
বিজেপি নেতা
ব্রিগেড সমাবেশ থেকে

"প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও আমাদের সরকার কৃষকদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আইন সংশোধনে রাজি। কিন্তু দয়া করে এই আইনকে ভুল বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।"

নরেন্দ্র সিংহ তোমর
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী
কৃষি আইন নিয়ে বিরোধীদের প্রতি

যোগ্য ও দায়বদ্ধসম্পন্ন দলই রাজ্যকে সুশাসন দিতে পারে

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোনার বাঙ্গলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এমন এক বাঙ্গলা যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, কলা, সাহিত্য-সহ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অগ্রণী হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বাধীনতা পরবর্তী যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও প্রশাসক পশ্চিমবঙ্গ শাসন করেছেন তারা তাঁর দেখানো স্বপ্ন কেউ পূরণ করতে পারেননি। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ ছয়ের দশক থেকে পিছোতে শুরু করেছে এবং পিছোতে পিছোতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এই পশ্চাদাপসরণের জন্য অনেকগুলি কারণ দায়ী। যেমন নেতৃত্বের সংকট, নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা, গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব এবং সর্বোপরি দলগত সদিচ্ছার অভাব। একবিংশ শতাব্দীর '২০-এর দশকে যখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করতে বসেছি এবং স্বাধীনতার ৭৩ বছর পর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত পার্টিকে তাঁরই রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আনার স্বপ্ন দেখছি, তখন এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে জনগণকে বোঝানো কীভাবে 'সোনার বাঙ্গলা' আমরা গড়ব এবং কেন 'সোনার বাঙ্গলা' শুধুমাত্র বিজেপিই গড়তে পারে।

একটি দেশ তথা রাজ্যে ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা ও ইতিবাচক মানসিকতা। বিজেপি তার দর্শন ও মতাদর্শে অটল থেকে বিভিন্ন রাজ্যে, সর্বোপরি কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় আসার পর সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ইতিমধ্যেই 'সোনার গুজরাট' করে তাঁর দক্ষতা ও ইতিবাচক মানসিকতার প্রমাণ দিয়েছেন। ফলে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে দক্ষতা, ইতিবাচক মানসিকতা, অভিজ্ঞতা ও সদিচ্ছা আছে যা 'সোনার বাঙ্গলা' গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বোঝা যায় যে, সামগ্রিক উন্নয়নের নিরিখে ওই রাজ্যগুলি ভারতবর্ষে প্রথম সারিতে আছে। আর কেন্দ্রে মোদীজীর নেতৃত্বাধীন সরকার উন্নয়নের নিরিখে দেশকে কোন উচ্চতায় নিয়ে গেছে তা সকলেরই জানা।

দেশে ও রাজ্যে সামগ্রিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। মোদীজী স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে দেশবাসীকে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন মন্ত্রীসভা উপহার দিয়েছেন। বলাবাহুল্য ২০১৪ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়ে সরকারের গায়ে কোনও দুর্নীতির দাগ লাগেনি। দেশবাসীর বিশ্বাস, মোদীজীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এইভাবেই বিভিন্ন রাজ্য দুর্নীতিমুক্ত শাসনব্যবস্থা উপহার পাবে। যদিও কংগ্রেস বারবার চক্রান্ত করেছে সরকারের গায়ে দুর্নীতির কাদা ছেঁটাতে, কিন্তু কোনোবারেই তা প্রমাণ করতে পারেনি। প্রত্যেকবারেই আদালত সরকারকে ক্লিনচিট দিয়েছে। ২০২১ সালের নির্বাচনের পর যখন পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠিত হবে তখন সেই সরকারও পার্টির নীতি ও মতাদর্শ মেনে মোদীজীর উপদেশ ও অভিভাবকত্বের উপর ভর করে চলবে এবং অন্যান্য রাজ্যের মতোই পশ্চিমবঙ্গকে একটি উন্নয়নশীল, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত শাসনব্যবস্থা উপহার দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়নের অভিমুখ ও উন্নয়ন পরিকল্পনাও ত্রুটিপূর্ণ। শিক্ষার উন্নয়ন শুধু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল নয়; প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়নে কয়েকটি নীল-সাদা বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

তৃণমূল শাসিত বর্তমান রাজ্য সরকারের শিল্প-বিরোধী ভাবমূর্তি রাজ্যে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের পথে অন্তরায় হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ জমিনীতি ও শিল্পনীতি, সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি ও অরাজক পরিস্থিতি শিল্পোদ্যোগীদের পশ্চিমবঙ্গ বিমুখ করে তুলেছে। তাই এই 'নেই-রাজ্যে' না আছে সরকারি চাকুরি, না আছে শিল্প সংস্থায় চাকুরি। একটি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি সুসংহত শিল্পায়ন পরিকল্পনা যেখানে বড়ো শিল্প, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য থাকবে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং শিক্ষিত যুবকদের শুধু চাকুরিমুখী করা নয়, তাদের শিল্পোদ্যোগী হওয়ার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা। এই লক্ষ্যে রাজ্য ও জেলা শিল্পকেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা

প্রদান করা দরকার যাতে তারা ভবিষ্যতে শিল্পোদ্যোগী হতে পারে। কারণ একটি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু চাকুরি দিয়ে হয় না, ছোটো ও মাঝারি শিল্পদ্যোগী নির্মাণের মধ্য দিয়ে হয়। কিন্তু দুঃখের কথা, বর্তমান রাজ্য সরকার বিগত দশ বছরে এসব কিছুই করেনি, আর পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার তো অনুভবই করেনি যে রাজ্যে শিল্পায়নের প্রয়োজন আছে। আশা করা যায়, আগামী মে মাসে বিজেপি সরকারে আসার পর এই ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। এক্ষেত্রে বিজেপির একটা সুবিধে হচ্ছে অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে একটি সুসংহত শিল্প পরিকল্পনা তৈরি করা তাদের কাছে অপেক্ষারত সহজ কাজ। দ্বিতীয়ত, বিজেপি যেহেতু একটি প্রগতিশীল, শিল্পবান্ধব ও পরিক্ষিত রাজনৈতিক শক্তি, তাই বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সরকারে আসার পর শিল্পোদ্যোগীরা রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হবেন ও রাজ্যে বিনিয়োগ করতে ভরসা পাবেন। তাই শিল্পবান্ধব সোনার বাঙ্গলা গড়তে বিজেপির সরকারে আসা একান্তভাবে প্রয়োজন।

একটি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, কড়া হাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, উপদেষ্টামণ্ডলীর দ্বারা সঠিক উপদেশ লাভ করে সেই অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা ইত্যাদির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন বর্তমান রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস রাখে না এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা ও স্বকীয়তায় বিশ্বাস করে না। এখানে বিরোধী রাজনীতির পরিসর খুবই নগণ্য। নাগরিক বা বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা যদি সরকারের নীতিগত সমালোচনা করে তাদের পুলিশি হেনস্থা ও মিথ্যে মামলার শিকার হতে হয়। সরকারের মধ্যেও মন্ত্রী ও আমলাদের মধ্যে তীব্র অবিশ্বাসের এক দমবন্ধ করা পরিবেশ। এই অসহিষ্ণু ও দুঃসহ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব নয়। আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। চারিদিকে অপরাধী ও সমাজ-বিরোধীদের বাড়বাড়ন্ত, নিয়ন্ত্রণ করার মতো কেউ নেই। শাসকদলের অধিকাংশ নেতা, মন্ত্রী ও বিধায়ক দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। এই পরিস্থিতি শিল্প বিনিয়োগ, সুস্থ সংস্কৃতি ও উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক নয়। রাজনীতিতে ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির পরিবর্তনের জন্য বিজেপির ক্ষমতায় আসা একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়নের অভিমুখ ও উন্নয়ন পরিকল্পনাও ত্রুটিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, শিক্ষার উন্নয়ন শুধু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল নয়; প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়নে কয়েকটি নীল-সাদা বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই হয়নি। প্রান্তিক মানুষকে ২ টাকা কেজি চাল দিলেই মানব উন্নয়ন সম্পূর্ণ হয় না। সেই চালের সঙ্গে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্য তাদের আয় বৃদ্ধি করারও প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারে এসব নেই। উল্লেখ্য, সামগ্রিক ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণে যে দূরদর্শিতা ও সদিচ্ছা প্রয়োজন, বর্তমান রাজ্য সরকারের তা নেই। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদেরও কোনো মতামত নেওয়া হয়নি, যা সরকারকে সঠিক দিশা দেখাতে পারতেন।

রাজ্যে বিগত দশ বছরে পরিকল্পনাহীন যেসব কাজ হয়েছে, তা অনুন্নয়নেরই নামান্তর। এছাড়াও সংসদীয় গণতন্ত্রে নেতৃত্বের যোগ্যতা ও দূরদর্শিতার একটি বড়ো ভূমিকা থাকে। তাই একটি রাজনৈতিক দলে যথার্থ পরিকাঠামো দরকার, যার মাধ্যমে সমাজ থেকে সঠিক ব্যক্তিকে নির্বাচন করে তাকে জনপ্রতিনিধি করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারবাদের আবর্তে এতটাই নিমজ্জিত যে এখানে নেতাদের নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পিতৃপরিচয়, বংশপরিচয় ও পরিবারের রাজনৈতিক পরিচয় বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রকৃত রাজনৈতিক মেধা, যোগ্যতা ও দায়বদ্ধতা উপেক্ষিত থাকে। কিন্তু বিজেপির রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। একটি জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন রাজনৈতিক দল হওয়ার নিরিখে বিজেপি সবসময় সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে যোগ্যতর ব্যক্তিদের তুলে এনে জনপ্রতিনিধি করেছে যাঁরা এখন সুনামের সঙ্গে দেশমাতৃকার সেবা করছেন। এই প্রসঙ্গে অনেক নামের মধ্যে অতি উল্লেখযোগ্য নাম অবশ্যই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। এঁরা প্রত্যেকেই অতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন শুধু যোগ্যতা ও দায়বদ্ধতার কারণেই। তাই সবদিক বিচার করে এটা বলাই যায় যে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বিজেপিই বিজেপির একমাত্র বিকল্প, যা আগামীদিনে রাজ্যটাকে সুশাসন দিতে পারবে।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং গবেষক)

With Best Compliments from-

A Well Wisher

বাঙ্গালিরা সচেতন না হলে বাংলা ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা পাবে না

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

স্নেহাংশু মজুমদার

সম্প্রতি নানান ফেসবুক গ্রুপের বিভিন্ন প্রদেশের সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। বাঙ্গালির ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাচীনত্বও উঠে এসেছিল সেই বিষয়ে। খুবই অবাক লাগল যে ভারতবর্ষের অনেকেই মনে করেন যে বাঙ্গালি একটি নবীন জনগোষ্ঠী এবং বাংলা একটি নতুন ভাষা। অবাঙ্গালি মানুষদের মধ্যে এই ধারণা তৈরির জন্য বাঙ্গালিরাই অনেকাংশে দায়ী। আমরা বাঙ্গলার বাইরে এই বার্তা গেছে যে একশো-দেড়শো বছরের আগে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর কোনো ইতিহাস নেই। অতএব নিশ্চয়ই বাঙ্গালি একটি নতুন জনগোষ্ঠী।

অথচ ইতিহাস খুঁড়ে দেখানো যায়, বাঙ্গালিরা বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে সগর্বে অস্তিত্ব রেখেছে এবং ভারতবিজয়ী সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। আজ নিজেদের অবহেলায় নিজেদের অতীতকে পুরোপুরি অস্তিত্বহীন

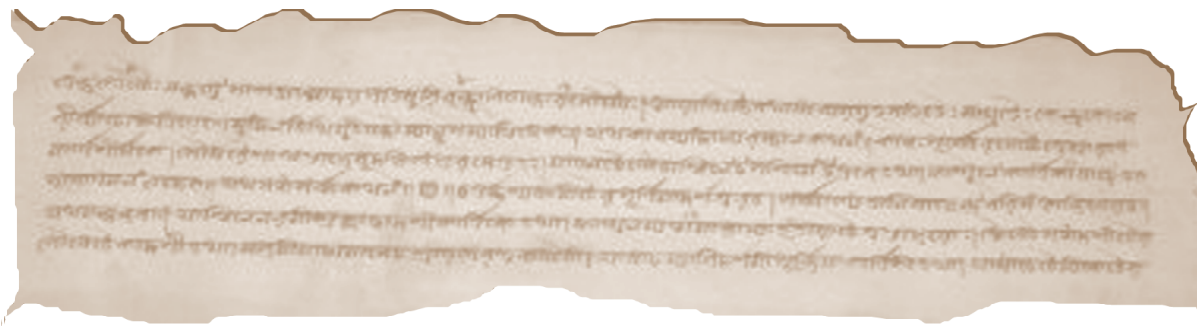

রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী নিয়ে যত মাতামাতি করি, তার আগের যুগের কৃতী বাঙ্গালিদের নিয়ে ততটা করি না। মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের যে সম্মান আছে, বঙ্গে মহারাজ শশাঙ্ক বা রায়শ্রেষ্ঠ প্রতাপাদিত্যরা তার সিকির সিকি ভাগ সম্মানও পান না। হিন্দিভাষীরা সাড়ে পাঁচশো বছরের পুরনো তুলসীদাসকে মনে রেখেছেন এবং এখনো ভক্তিভরে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করেন। বাঙ্গালি কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভুলে গেছে। অথচ কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুপ্রেরণাতেই আবধি ভাষায় তুলসীদাসী রামায়ণ রচিত হয়। নিজেদের অতীত নিজেরাই ভুলে গেলে, ফল যা হবার তাই হয়েছে। এতেই করে তুলেছে। নদীমাতৃক দেশ বাঙ্গলা। এই বিশ্বের সবথেকে উর্বরতম বদ্বীপ হলো বঙ্গদেশে। আর পৃথিবীর সমস্ত উন্নত সভ্যতা নদীতীরেই গঠিত হয়েছে। তাহলে সিন্ধু নদের তীরে যদি সিন্ধু সভ্যতা গঠিত হতে পারে, গঙ্গাপারের সবচেয়ে উর্বর অংশে কোনো সভ্যতা গঠিত হয়নি, এও কি সম্ভব?

বঙ্গদেশে যে অতি প্রাচীন সভ্যতা ছিল, তার বহু প্রমাণ বিদেশি সূত্র থেকে পাওয়া গেছে। শ্রীলঙ্কার প্রাচীন পুঁথি মহাবংশম-এ লেখা আছে বঙ্গদেশের রাজকুমার বিজয় সিংহের কথা, যিনি মাত্র সাতশো সেনা নিয়ে লঙ্কা জয় করেন। এই বিজয় সিংহের নামেই শ্রীলঙ্কার আদি নাম ছিল সিংহল। গ্রিকবীর আলেকজান্ডার যাদের ভয়ে কাঁটা হয়ে পিছিয়ে গেছিলেন, যুদ্ধবিদ্যায় অসীম পারদর্শী সেই গঙ্গাল জাতি ছিল এই বঙ্গে। গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস তার ইন্ডিকা গ্রন্থে যাদের 'গঙ্গারিডাই' বলে অভিহিত করেছেন। তবে গঙ্গাল নামে জাতির উল্লেখ অন্য কোনো সমসাময়িক সূত্র থেকে পাওয়া যায় না। ফলে গ্রিকরা জাতির নাম বুঝতে ভুল করেছিলেন, এমনটা অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে সেই জাতির নাম ছিল 'বঙ্গাল'; গঙ্গাপারের জাতি বলে গ্রিকরা ভুলবশত নামটি 'গঙ্গাল' বা 'গঙ্গার' লেখে। বহুবচনে গঙ্গারিড বা গঙ্গারিডাই। এত প্রাচীন যে জাতি, যারা এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে বিদেশি সূত্রকারেরা পর্যন্ত যাদের নাম উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছেন, সেই জাতি কোন ভাষায় কথা বলত? সেই ভাষার নাম কী ছিল? যে রাজ্যের নাম আদিকাল থেকেই বঙ্গ এবং জাতির নাম বঙ্গাল, সেই জাতির ভাষার নাম

কী হতে পারে? কারণ সাধারণত, রাজ্যের নামের সঙ্গে ভাষার নামের মিল থাকে। মহাভারতে পর্যন্ত উল্লেখ আছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পক্ষ নেবার জন্য যে বিভিন্ন দেশের রাজারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে বঙ্গরাজও উপস্থিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয় আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। সেই সময়েও বঙ্গে রাজত্ব ছিল। অর্থাৎ বঙ্গের সভ্যতা কত প্রাচীন, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়!

আমাদের এই মাতৃভাষা বাংলা, যে ভাষায় চর্যাপদ রচিত হয়েছে, মঙ্গলকাব্য হয়েছে, কবি জয়দেবের কাব্য রচিত হয়েছে, সুমধুর কীর্তন গান রচিত হয়েছে, রামপ্রসাদের মাতৃসাধনার শাক্তসংগীত রচিত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ভুবনবিজয়ী সাহিত্য রচনা হয়েছে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন' যে ভাষায় রচিত সেই বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা পাওয়া কি উচিত নয়?

● কোনো ভাষা ধ্রুপদী মর্যাদা অর্জন করার জন্য কী কী শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন এবং বাংলাভাষা কীভাবে ধ্রুপদী ভাষা হওয়ার যোগ্য তারই বরং একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যাক—

বাংলাভাষার প্রাচীনত্ব :

২০১৪ সালে তৎকালীন সরকারের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের বয়ান অনুসারে কোনো ভারতীয় ভাষা ধ্রুপদী/ক্লাসিকাল ভাষা বলে গণ্য হবার প্রথম লক্ষণটি হলো সে ভাষার প্রাচীনত্ব। এই সূত্রে সরকারি বয়ানে বলা হয়েছে যে বিবেচনাধীন ভারতীয় ভাষাটির প্রামাণ্য গ্রন্থ অথবা পুঁথিগুলির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা দরকার এবং ওই ভাষার জন্ম ও বিবর্তন সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত নথিবদ্ধ থাকা দরকার। প্রাচীনত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তৎকালীন সরকারের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত হিসেব অনুযায়ী, ভাষাটির ১৫০০-২০০০ বছরের ইতিহাস থাকা বাঞ্ছনীয়, এবং সে ইতিহাস লিখিত আকারে থাকতে হবে--- অর্থাৎ সেই ভাষার সর্বজনমান্য পণ্ডিত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রকাশিত গবেষণালব্ধ তথ্য হিসেবে বিবেচনাধীন ভাষাটির ইতিহাসের দলিল হাতের কাছে থাকা দরকার।

বিভিন্ন পণ্ডিত বিশেষজ্ঞের দ্বারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত গবেষণা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-সহ বিংশ শতাব্দীর তাবড় ভাষাবিদ তথা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞদের থেকে শুরু করে একেবারে আজ অবধি এই ইতিহাসগ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মান্য গবেষণাগ্রন্থটির রচয়িতা ড. সুকুমার সেন। ড. সেন-কৃত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' শীর্ষক পাঁচ খণ্ডের গবেষণামূলক মহাগ্রন্থটিতে বাংলাভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা সাহিত্য অবধি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক বিখ্যাত সব গবেষণাগ্রন্থ ও বক্তৃতা- সংকলন, যেমন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' (প্রকাশকাল ১৯২৬), তারও আগে প্রকাশিত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'দ্য হিস্ট্রি অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৯২০), দীনেশচন্দ্র সেন-কৃত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিট্‌রেচার' স্থান পেয়েছে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ড. সুকুমার সেন উভয় বিশেষজ্ঞের মতোই বঙ্গভাষার সূত্রপাত হয় খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে, কথ্যভাষা মাগধী প্রাকৃত থেকে লিখিত ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হয়ে বঙ্গভাষার পথচলা শুরু। আবার ড. চট্টোপাধ্যায় ও ড. সেনের সমসাময়িক বঙ্গভাষা-বিশেষজ্ঞ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-এর মত অনুযায়ী, কথ্য ও লিখিত গৌড় প্রাকৃত তথা গৌড় অপভ্রংশ থেকেই বঙ্গভাষার উৎপত্তি। এই হিসেবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লিখিত ও কথ্য রূপদুটির ইতিহাস অন্তত ১৩০০ বছরের পুরনো। ওই সময় থেকে শুরু হয়ে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভাষার বর্ণমালা একটি মোটামুটি সম্পূর্ণ রূপ ধারণ করে এবং ষোড়শ শতকের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাই আধুনিক বাংলা বর্ণমালা, যার যৎসামান্য পরিবর্তন সাধিত হয় ঊনবিংশ শতকে। অর্থাৎ আধুনিক বাংলাভাষা ও তার মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ একটা রূপ আজ থেকে পাঁচশো বছর আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, আর বাংলা বর্ণমালার অদিরূপের বয়স অন্তত তেরোশো বছর।

বাংলাভাষার প্রাচীন সাহিত্য সম্পদ :

তৎকালীন সরকারের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের রাজ্যসভাকে দেওয়া তথ্যের দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে কোনো ভাষা ধ্রুপদী মর্যাদা পাওয়ার দাবিদার হলে ওই ভাষায় রচিত কোনো প্রাচীন সাহিত্য অথবা কোনো প্রাচীন গ্রন্থ থাকা প্রয়োজন যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ওই ভাষাভাষী মানুষের কাছে মূল্যবান ঐতিহ্য বহন করে আসছে।

উত্তর হিসেবে বলাই যায়, বাংলাভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে সাহিত্যকর্ম ও বিভিন্ন গ্রন্থ বিদ্যমান যেগুলি অত্যন্ত প্রাচীন। এই সাহিত্যভাণ্ডারের প্রথম সাহিত্যকর্মের নাম হলো 'চর্যাপদ'। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ সংগ্রহ করেন, তার সংকলনই হলো 'চর্যাপদ'। চর্যাপদের পুনরাবিষ্কৃত পুঁথিগুলির বর্ণমালা দেখলে বোঝা যাবে এই ভাষা বাংলাভাষারই আদিরূপ। এই পদগুলির রচয়িতা শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের অনেকেই সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভত হয়েছিলেন, সেই হিসেবে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনের বয়স খুব কম করে হলেও বারো-তেরোশো বছর।

চর্যাপদগুলিতে 'বঙ্গাল দেশ', 'বঙ্গালী ভইলি', 'পঁউয়া খাল' (পদ্মা নদী) প্রভৃতি শব্দবন্ধের উল্লেখ মেলে, যার দ্বারা এই চর্যাগীতি যে বাঙ্গালির সম্পদ তা প্রমাণিত হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সুকুমার সেনের গবেষণায় স্পষ্ট যে চর্যাপদের ভাষাই বাংলাভাষার আদি রূপ।

ড. সেন তাঁর লেখা উপরোক্ত গ্রন্থে এই বিষয়ে জানাচ্ছেন :

'কুক্কুরীপাদের (চর্যাপদগুলির রচয়িতা চব্বিশজন কবির মধ্যে অন্যতম কবি) দুইটি চর্যার একটিতে 'গাইল' স্থানে 'গাইড়' ও 'সমাইল' স্থানে 'সমাইড়' পাওয়া যায় এবং

অপরটিতে 'ভণথি' পদ পাওয়া যায়। ইহা হইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই কবি ওড়িশা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু ওড়িশাতে 'গাইল' স্থলে 'গাইড়' হইতে পারে না, সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে একক অবস্থিত ল-কার থাকিলে, সেই 'ল' উড়িয়াতে মূর্ধন্য ল হইয়া যায়, 'ড়' হয় না, এবং প্রাকৃত '-ইল্ল' প্রত্যয়ের প্রতিরূপ বাঙ্গলা ও ওড়িশা উভয়ত্রই '-ইল'। 'গাউড়' ও 'সমাইড়' পদ দুইটির মূল হইবে গায়িত-ট ও সমায়াত-ট, এই দুটি উড়িয়ার নহে। 'ভণথি'র '-থি' প্রত্যয় মৈথিল ভাষার অনুসারী। ইহা নেপালে লিপিকারের (২) উপর মৈথিলের প্রভাবজাত। এই চর্যাদ্বয়কে প্রাচীন বাংলায় রচিত বলিতে কোনো আপত্তি হইতে পারে না।'

লুইপাদ, কাহ্নপা ছাড়াও চর্যার এক অতি প্রাচীন কবি ছিলেন ভুসুকু পাদ। সুদূর সৌরাষ্ট্র থেকে বঙ্গদেশে আসেন তিনি এবং স্থানীয় এক নারীকে বিয়ে করে এই বঙ্গদেশেই সংসার বাঁধেন। তাঁর নিজের কথায়— 'আজি ভুসুক বঙ্গালী ভইলি, নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলি'। অর্থাৎ সৌরাষ্ট্রের ভুসুকু আজ থেকে বাঙ্গালি হয়ে গেল। এই সব টুকরো টাকরা রচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী হিসেবে কতটা প্রাচীন।

বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্যের মৌলিকত্ব ও তার পারম্পর্য :

প্রাচীন বঙ্গভাষার সাহিত্য নিদর্শনের মধ্যে বাঙ্গালিত্ব খুব স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে অপভ্রংশ ছন্দের লক্ষণবিচার সংক্রান্ত একটি চতুর্দশ শতাব্দীর গ্রন্থে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত বেশ কয়েকটি শ্লোকের ভাষাকে ড. সেন মূলত প্রাচীন বঙ্গভাষা বলেই ঠাহর করেছেন। এগুলির মধ্যে একটি পদ নীচে উল্লেখ করা গেল।

ওগ্‌গরভত্তা রম্ভঅ-পত্তা গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা।

মোইলি-মচ্ছা নালিচ-গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা পুনবন্তা।

ড. সেন আধুনিক বঙ্গভাষায় এর অর্থ করেছেন : 'ওগ্‌রা ভাত, রম্ভার পাত, গাওয়া ঘি, দুগ্ধ সংযুক্ত, মৌরলা মাছ, নালিতা শাক—কান্তা দিতেছে, পুণ্যবান খাইতেছে।'

তামিল ভাষা যখন ধ্রুপদী স্বীকৃতি পায় তখন তার জন্য তামিলরাই এগিয়ে এসেছিলেন। একইভাবে তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম, ওড়িয়া ভাষার ধ্রুপদী স্বীকৃতির লক্ষ্যে সেই ভাষাভাষীরাই সোচ্চার হয়েছেন। বাঙ্গালিরাই বা কেন পিছিয়ে থাকবে? সোচ্চারে নিজেদের দাবি তুলতে হবে। তবেই বাংলা ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা পাবে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এই কাব্যে বাঙ্গালির প্রিয় খাদ্যবস্তুগুলির উল্লেখ রয়েছে, কাজেই এই পদ যে বঙ্গদেশে বঙ্গীয় কবির হাতে রচিত তা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয়না। এছাড়াও, মহাভারতে বঙ্গের উল্লেখ আছে। বঙ্গ বহু প্রাচীন জনপদ। চন্দ্রকেতুগড়ের খননের পর সেখানে অন্তত পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেখানকার সভ্যতা এত প্রাচীন, সেখানকার ভাষাও প্রাচীন হওয়াই কি স্বাভাবিক নয়? নিজস্ব ভাষা ছাড়া স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে ওঠা তো সম্ভব নয়।

প্রাচীন বঙ্গের মহাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়ে থাকলেও বঙ্গের সাহিত্য পরম্পরায়, বিশেষত বাংলা কাব্যপরম্পরায় বাঙ্গালির নিজস্ব কাব্য বলেই চিরকাল সম্মানিত হয়ে এসেছে। গীতগোবিন্দম্ কাব্য বঙ্গভাষার প্রাচীন কবি বড়ু চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ হয়ে একেবারে আধুনিকতম বাংলা ব্যান্ডের গানের কথাতেও আপন প্রভাব স্পষ্ট করে তুলেছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পরম্পরার ধারাবাহিকতার প্রশ্নে এটি একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান।

● বাংলা ভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা লাভ করা একান্তই প্রয়োজন। দেশভাগ হয়ে নিজের একটি বিরাট ভূখণ্ড বাঙ্গালি হারিয়েছে, তবু বাংলা ভাষাভাষী জনসংখ্যার নিরিখে বাংলা হলো ভারতের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ ভাষা। ধ্রুপদী/ক্লাসিকাল ভারতীয় ভাষার বিশিষ্ট পণ্ডিতদের দুটি বড়ো বার্ষিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া হবে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ধ্রুপদী ভাষাগুলির পঠনপাঠন ও সে বিষয়ে গবেষণার জন্য 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' স্থাপন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্বীকৃত ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষাগুলির জন্য বেশ কয়েকটি সম্মাননীয় 'চেয়ার' বা পদ চালু করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

এছাড়াও বাংলার পক্ষে আছে অনেক যুক্তি। এই ভাষাতেই ভারত সাহিত্যে নোবেল জয় করেছে। বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এতটা চর্চিত নয় অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা। বাংলাভাষার মতো আর কোনো ভারতীয় ভাষায় এত অনুবাদ হয়নি পৃথিবীতে। সার্বিক বিচারে এটি ভারতীয় উপমহদেশের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা, যার ধ্রুপদী মর্যাদা লাভ ভারতীয় শিক্ষাজগতের বিকাশে বিশেষ সহায়ক। তাই সার্বিক বিচারেই বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা প্রাপ্তির কোনো বাধাই থাকতে পারে না।

এখন সময় এসেছে নিজেদের দাবি নিজেরা জোর গলায় জানানোর। তামিল ভাষা যখন ধ্রুপদী স্বীকৃতি পায় তখন তার জন্য তামিলরাই এগিয়ে এসেছিলেন। একইভাবে তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম, ওড়িয়া ভাষার ধ্রুপদী স্বীকৃতির লক্ষ্যে সেই ভাষাভাষীরাই সোচ্চার হয়েছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে মারাঠি ভাষাও লড়ছে। বাঙ্গালিরাই বা কেন পিছিয়ে থাকবে? নিজেদের ইতিহাস জানতে হবে। সোচ্চারে নিজেদের দাবি তুলতে হবে। বাংলা খুব মিষ্টি ভাষা, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, বিবেকানন্দের ভাষা, কিন্তু শুধু এটুকুতেই ধ্রুপদীর মুকুট আসবে না। যেদিন বাঙ্গালি বাংলাভাষার স্বার্থে সরব হবে, সেদিনই বাংলা ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা পাবে। □

বাংলা ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা পেলে বাঙ্গালির ইতিহাস পূর্ণতা পাবে

স্বর্ণাভ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নেশন কী' প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, ভাষা জাতির একমাত্র পরিচয় কখনই হতে পারে না। ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি জাতিসত্তার অপরিহার্য উপাদান। বিখ্যাত ভাষাবিদ ও ভারতের জাতীয় অধ্যাপক (১৯৬৪) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাঙ্গালি সংস্কৃতি কখনই ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে পৃথক নয়, বরং তারই একটি অঙ্গ। সেক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহলে ভারতের পূর্বদিকে তথাকথিত 'বাংলাদেশ' নামের যে দেশটি সেই ১৯৭১ সাল থেকে নিজেদের 'স্বাধীন বাঙ্গালির দেশ' বলে দাবি করে, তারা কারা? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন স্বার্থে তারা নিজেদের বাঙ্গালি সংস্কৃতির একমাত্র ঠিকাদার হিসেবে দাবি করে চলেছে? কী কারণে বাঙ্গালির ৫০০০ বছরের ঐতিহ্য ধুয়ে মুছে এবং বাংলাভাষার ২০০০ বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাস কেটেছেঁটে মাত্র 'হাজার বছরের বাঙ্গালি জাতি' প্রমাণ করার চেষ্টা করছে এই সন্দেহজনক দেশটি? যার তালে সমানে তাল মিলিয়ে চলেছেন এই রাজ্যের গণ্যমান্য বঙ্গদ্রোহী মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা। এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

পূর্বতন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের (তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রক) ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যসভায় প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, একটি ভাষার 'ক্ল্যাসিকাল' বা 'ধ্রুপদী' হয়ে ওঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা হলো ওই ভাষায় রচিত আদি পুঁথি কম করে ১৫০০ থেকে ২০০০ বছরের পুরানো হতে হবে অথবা ওই ভাষার ইতিবৃত্তের কথা ততটাই পুরানো কোনো দলিলে নথিবদ্ধ থাকতে হবে এবং সেইরকম পুঁথি বা গ্রন্থমালাকে সংশ্লিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতিতে প্রাসঙ্গিক থাকতে হবে। প্রচলিত মতানুসারে, বাংলাভাষায় রচিত সবচেয়ে আদি গ্রন্থ চর্যাপদ বা চর্যাগীতি। কারণ তার আগে রচিত পুঁথি বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বাঙ্গলার সুদীর্ঘ হাজার বছরের পরাধীনতার কালে অনেক আগেই ধ্বংস হয়েছে। বাঙ্গালি হাজার বছরের পুরনো কখনোই নয়, বাঙ্গালি আসলে 'হাজার বছরের পরাধীন জাতি'! পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার। ড. নির্মল দাসের চর্যাগীতি পরিক্রমা নামক বই থেকে জানা যায় যে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে সর্বমোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ উদ্ধার করেন। এগুলির কোনোটি খ্রিস্টীয় অষ্টম অথবা সপ্তম শতকে রচিত। কেননা এই পদগুলির রচয়িতা লুইপাদের মতো প্রাচীনতর শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যগণ যারা পণ্ডিত ড. সুকুমার সেনের ভাষায়, 'তান্ত্রিক বজ্রাচার্য্য ও শৈব নাথাচার্য্যদিগের হস্তে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন হইল। অদ্যাবধি যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে সিদ্ধাচার্য্যদিগের সাধনতত্ত্বজ্ঞাপক 'চর্যাপদ'গুলিতে অঙ্কুরোদ্গত বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন রহিয়াছে।' এছাড়াও দ্বাদশ শতাব্দীর চালুক্যরাজ সোমেশ্বর ভূলোকমল্লের নির্দেশে বিরচিত অভিলাষার্থচিন্তামণি গ্রন্থের 'গীতবিনোদ' নামক সংগীত ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ক অধ্যায়ে চর্যাপদের সমসাময়িক বঙ্গভাষায় একটি রাধাকৃষ্ণগীতি এবং ভগবান বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্রের কিয়দংশ পাওয়া গেছে বলে ড. সেন জানিয়েছেন।

সুতরাং বাংলাভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণকারী উপাদান বহুদিন ধরেই প্রমাণিত সত্য হলেও তার ব্যবহার সেভাবে হয়নি। অর্থাৎ আমাদের প্রাণের ভাষাকে ধ্রুপদী ঘোষণা করায় বাধা কোনোদিনই ছিল না। সর্বপ্রথম ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পায় তামিল ২০০৪ সালে, ক্রমানুসারে ২০০৫ সালে সংস্কৃত, ২০০৮ সালে তেলুগু ও কন্নড়, মালয়ালম ২০১৩ সালে এবং সর্বশেষ ওড়িয়া ২০১৪ সালে। সংস্কৃত বাদে বাকি উল্লিখিত আঞ্চলিক ভাষাগুলির গরিমা

সংরক্ষণের জন্য সেইসব ভাষাভাষী রাজ্যের সরকার বরাবরই উৎসাহী ছিল। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল ও বিরোধী বাম কংগ্রেসের রাজনীতিবিদ এবং তাদের পেটোয়া বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধ্রুপদী ভাষার তালিকায় বাংলা নেই কেন বলে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছেন তাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আজ অবধি তাঁরা বাংলাভাষার সংরক্ষণের ব্যাপারে এতটাই নিস্পৃহ ছিলেন যে এটাও জানেন না ধ্রুপদী ভাষা কী এবং জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী। এই বুদ্ধিজীবীদের অজ্ঞতার ভাণ্ডার এতটাই সমৃদ্ধ যে তাঁরা বাংলার ধ্রুপদীভাষার স্বীকৃতির সমর্থনে বারবার রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনেন। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই একজন বিরাট মাপের কবি এবং বাঙ্গলা তথা বিশ্ব-সাহিত্যের এক বড়ো সম্পদ। কিন্তু ধ্রুপদীভাষা হবার অন্যতম শর্ত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনত্ব, যেটা রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে পূরণ হয় না। রবীন্দ্রনাথের জন্ম আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে আর ধ্রুপদী হতে গেলে চাই ১৫০০ বছর। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে ঢাল করে ধ্রুপদী হতে গেলে বাংলাভাষা ও বাঙ্গালিকে অপেক্ষা করতে হবে আরও (১৫০০-১৫০) = ১৩৫০ বছর।

আসল কথা হচ্ছে এই বাঙ্গালির নাম নিয়ে সস্তা রাজনীতি করা বুদ্ধিজীবীরা আদৌ কোনোদিন চাননি যে বাংলাভাষা তার ন্যায্য স্বীকৃতি পাক। তাই তারা বাংলাভাষার ধ্রুপদী স্বীকৃতির কথাও বলেন, আবার ধ্রুপদী স্বীকৃতির জন্য রবীন্দ্রনাথকেও টেনে আনেন। যেন রবীন্দ্রনাথের আগে বাঙ্গলায় কোনো কবি-সাহিত্যিক আসেননি। যেন ওই দেড়শো বছরেই শুধু বঙ্গলায় সাহিত্য হয়েছে। তার আগে যেন জাতিটা গণ্ডমূর্খ ছিল, কবিতা লিখত না, গল্প বলত না, শিল্পচর্চা করত না। কবির লড়াই, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি ইত্যাদি তাঁদের স্মৃতি থেকে কর্পূরের মতো উবে গেছে। তাঁদের এই বিস্মৃতির পিছনেও একটা অভিসন্ধি আছে। বিশ্বমানবতার মতবাদে যারাই আস্থা রেখেছেন, তাদেরই নিজেদের অস্তিত্বের শিকড় নিজের হাতে কাটতে হয়েছে। সেই

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

ড. সুকুমার সেন

কলঙ্কিত ঐতিহ্য কখনোই চায়নি বাঙ্গালি তার মাতৃভাষার শুদ্ধতা ও উৎকৃষ্ট ঐতিহ্য ধরে রাখুক। এরা দিনের পর দিন চেষ্টা করে গেছেন বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠী যাতে বাংলাভাষা এবং বাঙ্গালি জাতিসত্তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারে। সেই কারণেই 'বাংলায় কথা বললেই বাঙ্গালি' নামক তত্ত্বের আবিষ্কার, যাতে 'মুসলমান = বাঙ্গালি' নামক বিকৃত মিথ্যাচারকে রাতারাতি সত্যি করে দেওয়া যায়। আর বাংলায় কথা বললেই যদি বাঙ্গালি হয়, তাহলে সব থেকে বেশি 'বাঙ্গালি' বাংলাদেশেই রয়েছে। এইভাবে সংখ্যা দিয়ে না হয় ভাষা ও জাতিসত্তার সাময়িক দখল পাওয়া গেল। কিন্তু চিরকালীন দখল পেতে গেলে তো ইতিহাসের উপর কবজা করতে হবে। মুছে দিতে হবে বাংলাভাষা ও বাঙ্গালির পৌত্তলিক ইতিহাস। শুধু সেই সময়টুকুরই ইতিহাস বাঁচিয়ে রাখতে হবে, যতটুকুতে সমকালীন বাংলাভাষী মুসলমানদের সাহিত্যচর্চা পাওয়া যায়। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের উপর এই অত্যধিক জোর দেওয়া। এটা রবীন্দ্র ভক্তির নিদর্শন নয়, বরং অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। বাংলাভাষার পুরোনো ইতিহাস বাঙ্গালির স্মৃতি থেকে সরিয়ে দেবার ঐকান্তিক প্রয়াস।

এই ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারের পুস্তক স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রম থেকে সরিয়ে দেওয়ায়, মুসলমান আগ্রাসনের ইতিহাসকে মুছে ফেলায়, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক বাংলার চিরাচরিত বানানবিধি উপেক্ষা করে ঢাকা অ্যাকাডেমির অনুকরণে বিকৃত বানান লেখার প্রচলন করায়, রাজা শশাঙ্কের ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যাভিষেক থেকে যে বঙ্গাব্দের সূত্রপাত তাকে সম্রাট আকবরের কৃতিত্ব বলে প্রচার করায়। অন্যদিকে বাংলাদেশ 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি' নামক একটি প্রচার বাজারে এনেছে বেশ কিছু বছর হলো যেখানে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও মুসলিম লিগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যার আরেক পরিচয় ১৯৪৬ সালে 'কলকাতার কসাই হুসেন সোহরাওয়ার্দির ডান হাত হিসেবে। যাইহোক, এই প্রচারের মূল সমস্যা হলো 'হাজার বছর' কথাটি। হাজার বছর আগে বাঙ্গলায় ইসলামি আগ্রাসনের সূচনা হয়েছিল যাকে স্বাভাবিক ভাবেই বাংলাভাষী ইসলামি দেশ বাঙ্গালি জাতিসত্তার যাত্রার সূচনা বলে গণ্য করে। কিন্তু বাঙ্গালি জাতিসত্তার ইতিহাস কম করে পাঁচ হাজার বছরের পুরানো; যে ইতিহাসে গ্রিকবীর আলেকজান্ডারের বুকে কাঁপন ধরানো গঙ্গারিডাই সভ্যতা, রাজা চন্দ্রকেতু, লঙ্কাজয়ী রাজা বিজয় সিংহ, পালরাজা ও তাদের আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট সাম্রাজ্য, ভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর, ভিক্ষু শীলভদ্র, বৌদ্ধবিহার বিক্রমশীলা, নালন্দা, ওদন্তপুরী

থেকে পর্তুগিজ হার্মাদদের নিকেশ করা বিরাট নৌবাহিনীর অধিপতি রাজা প্রতাপাদিত্য, তুর্কি সেনাদের বনে জঙ্গলে ঘুরিয়ে মারা রাজা ইছাই ঘোষ (যে ঘটনা থেকে 'তুর্কি নাচন' প্রবাদটির জন্ম), পাঠান পেটানো বিখ্যাত ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজবংশের রায়বাঘিনী রানি ভবশঙ্করী ও মহারাজা রুদ্রদমন এবং বাঙ্গলার নবজাগরণের অগ্রদূত মনীষী সবাই অন্তর্ভুক্ত।

আব্রাহামিক ধর্মের আগ্রাসন যেখানেই হয়েছে সেখানেই পূর্ববর্তী ইতিহাসকে 'নিকৃষ্ট, অসভ্য' আখ্যা দিয়ে তাকে সমূলে বিনষ্ট করার প্রবণতা দেখা গেছে। বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পোড়ানো সেই জান্তব প্রবণতার নিদর্শন। এই বিনষ্টের কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে হয়েছে আরব দুনিয়ায় যেখানে ইসলাম পূর্ববর্তী ইতিহাসের নিদর্শন প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। প্রাক ইসলাম মূর্তিপূজারি আরবদের সভ্যতাকে 'আইয়ামে জাহিলিয়াত' অর্থাৎ 'অন্ধকার যুগ' বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে যদিও সেই যুগেরই ধনী স্বাবলম্বী মহিলা ছিলেন খইদজা বিবি! সাম্প্রতিককালে আমরা দেখেছি, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান সেদেশের সরকারি চ্যানেলে একটি জনপ্রিয় তুর্কি টিভি সিরিজ 'এরতাঘরুল গাজ' সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন এবং জনগণকে সেটি দেখতে অনুরোধ করেছেন, কারণ ওই শোতে নাকি পাকিস্তানি জনতার ইতিহাস আছে! আপাত দৃষ্টিতে এমন হাস্যাস্পদ দাবির পেছনের মূল কারণটি হলো পাকিস্তানের বর্তমান জাতিসত্তা ইসলামিক জাতিসত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই এক তুর্কি নায়কের ইতিহাস তাদের যতটা আপন হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, মেহেরগড়, তক্ষশীলা তাদের মনস্তত্ত্ব থেকে ঠিক তত আলোকবর্ষ দূরে। সেই কারণেই একটি ইসলামিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে ইসলাম পূর্ববর্তী গঙ্গারিডাই সভ্যতা বা পালরাজাদের গৌরবময় ইতিহাসের উত্তরাধিকার দাবি করা বা তাঁর অস্তিত্বও স্বীকার কখনই সম্ভব নয়। তাই তারা এই 'হাজার বছরের' মধ্যেই বাঙ্গালি পরিচয়টি সীমাবদ্ধ রাখতে চায়; ঠিক সেই কারণেই তারা বাঙ্গালি রাজ্য গৌর গোবিন্দের হত্যাকারী, বাঙ্গালির বৌদ্ধবিহার ধ্বংসকারী ইয়েমেনের দস্যু শাহজালালের নামে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নামকরণ করে। কারণ মুসলমান হতে পারলেও প্রকৃত বাঙ্গালি হতে তাদের ঢের দেরি। ১৯০৫ সালে ধর্মের ভিত্তিতে কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে তৎকালীন বাংলাভাষী আরবদের 'মুসলিম লিগ' প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তীকালে নোয়াখালি-বরিশালের বাঙ্গালি গণহত্যা সেই প্রবণতার ধারাবাহিকতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুসারে ধ্রুপদীভাষার পণ্ডিতদের দুটি বড়ো আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া হবে। পঠনপাঠন ও গবেষণার জন্য সেন্টার ফর এক্সেলেন্স গঠন করা হবে, উচ্চশিক্ষা কমিশন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ভাষাগুলির জন্য বেশ কয়েকটি সম্মাননীয় 'চেয়ার' চালু করবে। এছাড়াও বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাভাষায় কাজের সুযোগ তৈরি হলে সেখানে বাঙ্গালিরা অগ্রাধিকার পাবে। শুধু ভাষা দিয়ে হয় না জাতি। তার জন্য প্রয়োজন ধর্ম-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি। বাংলা ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা পেলে বাঙ্গালির ইতিহাস পূর্ণতা পাবে। বাঙ্গালিকে তার ইতিহাস ভুলিয়ে দিয়ে 'বাঙ্গালি কারা' সেই পরিচয় গুলিয়ে দেবার অপ-সংগ্রাম বাধাপ্রাপ্ত হবে। এই স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিরাট প্রভাব ফেলবে। সারা বিশ্ব জানবে, বাংলাভাষা অন্তত দু' হাজার বছরের পুরনো। তাই যে বাংলাদেশিরা নিজেদের 'হাজার বছরের বাঙ্গালি জাতি' বলে দাবি করে তারা আসল বাঙ্গালি হতেই পারে না, কারণ বাংলা ও বাঙ্গালি তার আগেও ছিল। এই সরকারি সিলমোহর আসল বাঙ্গালির সঙ্গে নকল বাঙ্গালির পার্থক্য গড়ে দেবে। তাই বাঙ্গালি জাতিসত্তা রক্ষার্থে এই মর্যাদা এখন সময়ের দাবি। ধ্রুপদীভাষার স্বীকৃতি বাঙ্গালির ন্যায়সিদ্ধ অধিকার আর আমরা তা অর্জন করবই। নতুন বছরে এ আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। ▯

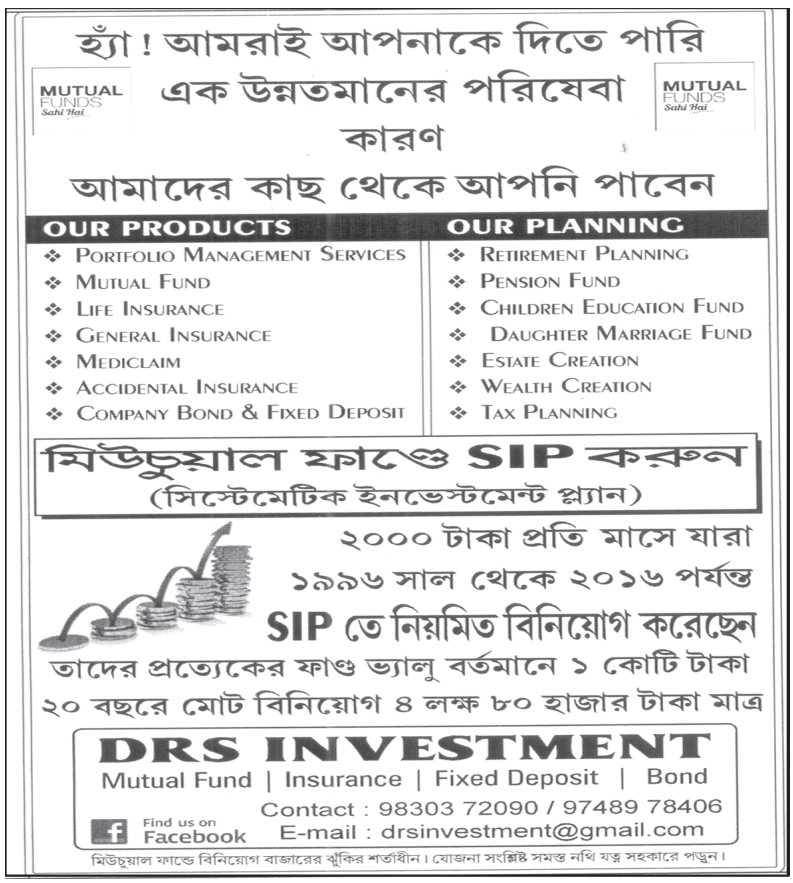

কুরুক্ষেত্র নামের উৎস প্রসঙ্গে

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ভারতকোষ থেকে জানা যায়, বর্তমান কুরুক্ষেত্র শহর দিল্লি থেকে ১৬০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। প্রাচীনগ্রন্থে সরস্বতী নদী উপত্যকা অঞ্চলকে কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ কুরুদের ভূমি বলা হয়েছে। পবিত্র কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী ছাড়া দৃষদ্বতী, আপয়া প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হতো। এই ভূভাগে শরণ্যাবৎ নামক হ্রদও ছিল। কথিত আছে, ভরত বংশীয় রাজা কুরু ক্ষেত্রটি কর্ষণ করান বলে স্থানের নাম হয় কুরুক্ষেত্র।

এখন উপরোক্ত তথ্যগুলো বিচার করা যাক। আলোচ্য ক্ষেত্রে সরস্বতী ইত্যাদি নদী প্রবাহিত হতো এবং নদীধারা পরিবর্তনশীল। প্রসঙ্গক্রমে সরস্বতী নদীরই কথা বলা যায়। ছেড়ে যাওয়া নদীখাতগুলো শুকিয়ে যাওয়া উবর খাবর বা উঁচু নীচু ভূমিতে পরিণত হতো। এরূপ ভূমি নদীধারা দ্বারা কর্ষিত বা কুরিত বা কুরু হয়েছিল বলে মনে হতো। তাই নাম হয় কুরুক্ষেত্র। প্রথমে কুরু নামে কোনো রাজা ছিল না। তবে যে রাজা এবড়ো-খেবড়ো ভূমিকে সমতল করে বাসযোগ্য করান তিনি কুরু রাজা নামে পরিচিত হতে পারেন। কুরুক্ষেত্র পবিত্র নদী সরস্বতী দ্বারা কুরিত বা কুরু হওয়ার জন্য কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র নামে পরিচিত হয়। এই নিয়ে আরও গবেষণা জরুরি।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ।

বাংলাদেশে বাংলাভাষার শোচনীয় অবস্থা

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সাড়ম্বরে ভাষা দিবস পালিত হয়েছে বাংলাদেশে তো বটেই পশ্চিমবঙ্গেও। বহুবার শোনা গেল সেই গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কী ভুলতে পারি...'। না ভোলা সম্ভব নয়। আমরা কিন্তু অতি সহজেই ভুলে গেছি ১৯৪৬ সালের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের কথা। ১৬, ১৭ ও ১৮ আগস্ট কলকাতার বুকে যে তাণ্ডব সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা। ওই তিন দিনে প্রায় ১৬ হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল। ভুলে গেছি অক্টোবরে নোয়াখালি গণহত্যার কথা যে সময় ৬ থেকে ৬০ বছরের শিশুকন্যা-সহ কিশোরী, তরুণী, বৃদ্ধা কেউই নিস্তার পায়নি ওই বর্বর পশুগুলির বর্বরোচিত অত্যাচারের হাত থেকে। আমরা সব ভুলে গেছি কিন্তু ভুলতে পারিনি 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। কিন্তু যে বাংলাভাষাকে নিয়ে এত আবেগ বাংলাদেশে সেই বাংলাভাষার কী অবস্থা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। ওদেশে জল বললে কেউ কিছু বোঝে না, পানি বলতে হয়। মাংস কী কেউ জানে না, গোস্ত জানে। শিশির কী কেউ জানে না, তবে শবনম জানে। তাই লীলা বা লালী হয়েছে লায়লা, কমল হয়েছে কামাল। ওদেশে কেউ স্নান করে না, তবে গোসল করে। ওদেশে হাসি হয়েছে হাসিনা, মল্লিকা হয়েছে মালেকা, আশা হয়েছে আয়েশা। বাংলাদেশে কেউ শিষ্টাচার জানে না তবে সহবত্ জানে, ওদেশে কোনো অমুসলমান নেই, তবে জিম্মি, কাফের, মালাউন, মুরতাদ আছে অনেক। কোনও পণ্ডিত নেই তবে উলেমা আছে অনেক। কোনো শয়তান নেই তবে ইবলিস আছে। ওদেশে কেউ প্রাতরাশ করে না, তবে নাস্তা করে। ওদেশে কেউ ঠিক কথা বলে না, তবে মারহাব্বা বলে। বাংলাদেশে দিদি হয়েছে আপা। একইভাবে প্রদীপ হয়েছে চেরাগ, অহংকার হয়েছে দেমাক, গুরুজন হয়েছে মুরুব্বিগণ, ধার্মিক হয়েছে দ্বীনদার। কেউ স্বপ্ন দেখে না তবে খোয়াব দেখে। একই রকমভাবে বিদ্যা হয়েছে এলেম, কৃপণ হয়েছে বখীল, ধনী হয়েছে মালদার, সৃষ্টি হয়েছে পয়দা, নিষ্পাপ হয়েছে বেগুনাহ, দুরাত্মা মানে গরিব, ইতর প্রাণী হয়েছে জানোয়ার, কৃতজ্ঞতা হয়েছে শোকর গুজরি বা শোকরানা, জ্ঞান হয়েছে আক্কেল, শিষ্য হয়েছে মুরিদ, পুণ্য হয়েছে ছওয়াব।

তাই আমার বিশ্বাস বাংলাদেশে থাকতে হলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিকে নতুন করে বাংলাভাষা শিখতে হবে।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

মমতা ব্যানার্জি এত অসহিষ্ণু কেন?

২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বক্তৃতা করতে উঠলে কিছু শ্রোতা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিলে তিনি অপমানিত বোধ করে বক্তৃতা না দিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন। এই নিয়ে দেশের সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলগুলি চায়ের কাপে ঝড় তুলেছেন। পক্ষান্তরে মুখ্যমন্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে কুবাক্য প্রয়োগ করেন তখন সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলগুলি মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। মথুরাপুরে এক সভায় মমতা দিদি বলেন, 'মিথ্যা কথা বলার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে কান ধরে উঠবোস করানো দরকার'। এর পরেই তিনি 'সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্রৈব্যকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে' শ্লোক দিয়ে সভা শেষ করেন। অন্য এক জনসভায় তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানোর কথা বলেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিকে 'নাড্ডা ফাড্ডা হাড্ডা গড্ডা' বলে ব্যঙ্গ করেন। আর এক বিজেপি নেতাকে অসুরের মতো দেখতে বলে ব্যঙ্গ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে স্মরণ করাই, ইন্দিরার মৃত্যুর আগের বছর ইন্দিরা গান্ধী যখন কাশ্মীরে ইকবাল পার্কে এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন তখন একদম সামনের সারিতে বসে থাকা মুসলমান দর্শকরা নিজেদের যৌনাঙ্গ উন্মুক্ত করে বসেছিলেন। তখন তার মুখে কোনো প্রতিবাদের কথা শোনা যায়নি, তখনও তিনি কংগ্রেস নেত্রী ছিলেন। সেই ঘরানার মমতা ব্যানার্জি এত অসহিষ্ণু কেন?

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের কর্মচারীরা অন্ধকারেই রয়ে গেছেন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে গত ৩ ডিসেম্বর, ২০১০ আনন্দবাজার পত্রিকায় (কলকাতা সংস্করণ পৃষ্ঠা নং ৯) বিজ্ঞাপন মারফত বিভিন্ন পদে স্থায়ী ১৬৬ জন কর্মচারী (অর্থ দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে) নিয়োগের জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছিল। আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল ২২ ডিসেম্বর ২০১০। হাজার হাজার আবেদন পত্র পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদে জমা পড়েছিল। চাকুরি প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের কোষাগারে জমা পড়েছিল।

পরীক্ষা-সূচি এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম প্রকাশ করে চাকুরি প্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ৫ জুন ২০১১ (রবিবার) আনন্দবাজার পত্রিকায় (কলকাতা সংস্করণ পৃষ্ঠা নং ৭) বিজ্ঞাপন মারফত পরীক্ষা স্থগিত রাখার কথা চাকুরি প্রার্থীদের জানানো হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের পরীক্ষাও হয়নি এবং স্থায়ী কর্মচারি নিয়োগও হয়নি। এখানে উল্লেখ থাকে যে, স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনস্বার্থে কোনো মামলা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ রাজ্যের আইন সভায় পাশ হওয়া আইনি ক্ষমতা বলে বিগত অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময় ধরে একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে পরিচিত। যদিও মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ামক সংস্থাটি ১৯৫০ সালের দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে। এর উদ্বোধন করেন তৎকালীন রাজ্যপাল ড. কে.এন. কাটজু ওই বছরের ৩ মে। কাজেই আর কয়েকটি বছর পরেই আসন্ন প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী। অথচ বহু বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটির স্বশাসন প্রত্যাহৃত।

বিগত ২০১১ সালের শেষদিকে পর্ষদের কার্যকরী সমিতির মেয়াদ সমাপ্তির পরে আজ পর্যন্ত পর্ষদে কোনো নির্বাচন করা হয়নি। ডব্লুউবিবিএসই অ্যাক্ট, ১৯৬৩-এর সংশ্লিষ্ট ধারাকে ধারাবহিকভাবে উপেক্ষা করে বছরের পর বছর প্রশাসক নিয়োগ করে কার্যত পর্ষদের সাংবিধানিক পবিত্রতাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে।

শুধু কি তাই? বিগত ৩০ জুলাই, ২০১৬ গেজেট নোটিফিকেশন জারি করে সাত সদস্যের একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওই কমিটিকে (যেখানে কোনো পর্ষদ কর্মচারীকে স্থান দেওয়া হয়নি) মধ্য শিক্ষা পর্ষদের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয় [No. 957-ES/S/10M-119/2012 (Pt.-I)]। এখনও তা সমানে চলছে। হারিয়ে গেছে 'অ্যাডহক' শব্দবন্ধটির আক্ষরিক তাৎপর্য।

বস্তুত পর্ষদের 'সভাপতি' পদটির ধার ও ভার দুই-ই এখন অস্তমিত এবং আইনের চোখে পর্ষদ কার্যত বর্তমানে একটি নোমিনেটেড বোর্ড মাত্র। এর 'সচিব' পদটিও বহুদিন ফাঁকা। আরও আশ্চর্যের, তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ মোতাবেক জানা যায় যে, আজ পর্যন্ত মধ্য শিক্ষা পর্ষদের কর্মচারীদের জন্য অনুমোদিত কোনো সার্ভিস রুল নেই! তাই কোনো ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া করলেই কর্মচারীদের ওপর প্রয়োগ করা হয় ২১ আইনের দাওয়াই। আজ এরই নাম স্বাধিকার!

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের পথ চলা শুরু হয়েছিল। ১৯৫২ সাল থেকে প্রথম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ একটি স্ব-শাসিত সংস্থা। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ৭০ বছর পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ স্ব-শাসিত সংস্থা হিসেবে পরিচালিত হলেও আজও পর্যন্ত পর্ষদ কর্মচারীদের নিজস্ব কোনো সার্ভিস রুল অ্যান্ড রেগুলেশান্স নেই। যখন যে শাসক ক্ষমতায় থেকেছেন সে তার মতো করে পর্ষদ কর্মচারীদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ যখন যেমন, তখন তেমন ভাবেই কর্মচারীদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ যখন যেমন, তখন তেমন এইভাবেই কর্মচারীদের কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে। কোথাও কোনো ন্যায়বিচার পাবার অধিকার নেই। প্রদীপের নীচের গাঢ় অন্ধকারেই পর্ষদ কর্মচারীরা রয়েগেছেন।

—**সুমন্ত বিশ্বাস,**
স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া।

সিপিএমের খোয়াবনামা

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সারা দেশ এই শতাব্দীর সেরা প্রহসনটি দেখল। কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী, সিপিএমের বিমান বসু এবং সদ্যভূমিষ্ঠ ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের আব্বাস সিদ্দিকিকে একসঙ্গে ব্রিগেডের মঞ্চে দেখা গেল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মাত্র ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে সিপিএম কোমায় চলে গিয়েছিল। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাই অক্সিজেন খুঁজতে ফুরফুরা শরিফের মৌলবাদী নেতা আব্বাস সিদ্দিকির শরণাপন্ন হয়েছে। এদিন ব্রিগেডে যা লোকসমাগম হয়েছিল তার ৮০ শতাংশই সিদ্দিকির অনুগামী। সিদ্দিকির ভাষণ শেষ হওয়া মাত্র তারা যে-যার বাড়ির পথ ধরেন। তখন মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন দেবারতি হেমব্রম। এটা যে কত বড়ো অপমান তা যে-কোনও বুদ্ধিমান মানুষই বুঝতে পারবেন। কিন্তু বিমানবাবুদের হেলদোল নেই। তারা খোয়াব দেখছেন, সিদ্দিকি মুসলমান ভোট ভাগ হওয়া আটকে দেবেন। এবং মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের গরিষ্ঠাংশ ও কিছু হিন্দু ভোটের সাহায্যে তারা ক্ষমতা দখল করবেন। বিমানবাবুদের খোয়াব বোধহয় খোয়াবই থেকে যাবে। কারণ সিদ্দিকির সঙ্গে মাখামাখি পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণকে ত্বরান্বিত করবে। সিপিএমের হাতে পেন্সিল ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

—**রণবীর সমাদ্দার,**
বিরাটি, কলকাতা-৫১।

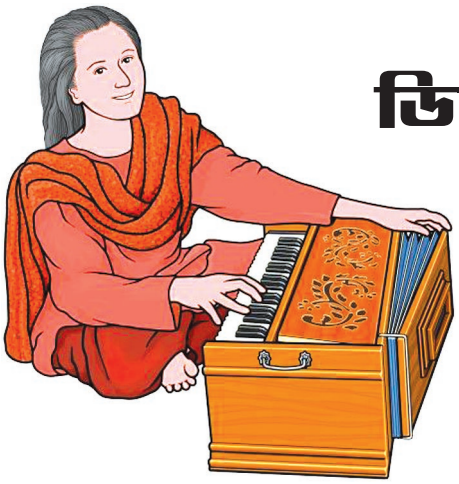

ডিপ্রেশন নয়, নিজেকে ভালো রাখুন

মৌ চৌধুরী

অনেকদিন পর অর্পিতার সঙ্গে দেখা হলো ওর স্কুলের বন্ধু সীমার। অর্পিতা সদ্য শাশুড়ি হয়েছেন। আর সীমা বছর দুয়েক আগে। দুই বন্ধুর সাময়িক উচ্ছ্বাসের পর অর্পিতা নিজের হাতের মোটা ফাইল দেখিয়ে জানালেন তিনি ডাক্তার দেখিয়ে ফিরছেন। আর সীমা তাঁর ভারী ব্যাগ তুলে ধরে বললেন ওষুধ কিনে ফিরছেন। অর্পিতার আক্ষেপ দীর্ঘদিন অনেক টেস্ট করিয়ে হাজারো ওষুধ খাইয়ে প্রচুর টাকা খরচের পর এবার চিকিৎসক পরামর্শ দিয়েছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে কাউন্সেলিং করাতে। তবে কি তিনি মনোরোগী, এমনটাই ভাবছেন অর্পিতা। যদিও তাঁর চিকিৎসক জানিয়েছেন কারোর কাউন্সেলিং করানো মানেই তিনি মনোরোগী নন। কিন্তু মনের কাঁটা যাচ্ছে না। কারণ সমাজের কাছে মনোরোগী মানেই তো সকলের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া। অনেকের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের এই দুই গৃহবধু কখনই অসুখ বিলাসী নয়। তবুও হাজারো ব্যস্ততা আর সংসার, পরিবার পরিজনদের নিয়ে চলতে গিয়ে এই মাঝ বয়েসে এসে যেন তাঁদের মনে হচ্ছে অনেক কিছুই পাওয়া হলো না। সংসারে সব উজাড় করে দিয়েছেন কিন্তু বিনিময়ে কিছু পাননি। পাশাপাশি একে একে থাইরয়েড, ইউরিক অ্যাসিড, অম্বল, স্থূলতা, রক্তচাপ, গাঁটে ব্যথা, চোখে ক্রমেই বেড়ে চলা পাওয়ার, কোনও কিছুই ভালো না লাগা চেপে বসেছে। প্রথমে জেনারেল ফিজিসিয়ান তারপর গাইনি, অর্থোপেডিক, নিউরো, গ্যাস্ট্রো, রিউমাটোজলিস্ট-লিস্টের শেষ নেই। সঙ্গে হাজারো টেস্ট ও নানাবিধ ওষুধ। হাজারো বিধিনিষেধ। সবার শেষে মনোবিদের কাছে রেফার।

যাদের কিছুই ভালো লাগছে না এবং যারা একটা সময় এসে নিজের জন্য কিছুই পেলাম না বলে মনে করেন তাঁরা কি একবারও নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন। সত্যি কি সংসারে তাঁরা তথাকথিত চরম বঞ্চিত চরম অবহেলিত?

কোনও ভুল নেই এখনও হাজারো নারী তাঁদের শ্বশুরবাড়িতে, স্বামী-সন্তানের কাছে, বাবা-ভাইয়ের কাছে, কর্মস্থলে এমনকী পথেঘাটেও যথাযোগ্য মর্যাদা পান না। চোখের জল, বুকের ব্যথা ও ভাগ্যকে মেনে মুখ বুজে সব সহ্য করেন।

এই নিবন্ধ সেইসব অবহেলিত নারীদের নিয়ে নয়। কিন্তু যারা নিজেরা রোজগেরে বা স্বামী কিংবা পারিবারিক উপার্জনের সূত্রে কিছুটা সচ্ছল বা যথেষ্ট ধনী সেই মহিলাদের প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রাম তুলনায় সহজ। তবু কেন এত অসুখ, যেখানে ভারতের জলমাটির গুণে প্রকৃতি থেকেই ভালো থাকার রসদ খুঁজে পাওয়া যায়?

যারা পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা সামান্য উলটেপালটে দেখে আলমারিতে বন্ধ রেখে দিয়েছেন অথবা দীক্ষা গুরুর উপদেশ উপেক্ষা করে গয়না-শাড়ি, পরচর্চা, সোশ্যাল মিডিয়া, সন্ধ্যার টেলি সিরিয়ালে নিমজ্জিত তাঁরাও জানেন মহা ঋষিগণ আমাদের নিজের মতো করে আনন্দে থাকতে বলেছেন। এই আনন্দ টেলি সিরিয়াল বা পরচর্চায় নেই। তবে নিজের জন্য সামান্য প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে বা ইচ্ছে হলে অন্যভাবে রূপচর্চা বা নিজেকে উত্তীর্ণ করার চর্চা করা যেতেই পারে। বহু বছর আগে ঋষি উদ্দালক বলেছেন, এমন কোনও মানুষ নেই যার কোনও গুণ নেই। শুরু করুন এভাবে— স্কুল জীবনের হারমোনিয়ামের ধুলো ঝেড়ে বসে পড়ুন। শাশুড়ি, স্বামী, ননদ, প্রতিবেশীরা হাসবে তো বেশ, সংকোচ ঝেড়ে ফেলুন আর শব্দ করে দরজা বন্ধ করে রেওয়াজ শুরু করুন। ছেলের স্কুলের পুরনো খাতার সাদা জায়গায় গল্প, কবিতা, নিবন্ধ লিখুন। সেতার, সরোদের ধুলো মুছে নতুন তার কিনে আনুন। পাড়া কাঁপিয়ে ডা ডা ডা আওয়াজ হোক। মিলিয়ে নেবেন তিনদিন পর প্রতিবেশীরাও তাঁদের গলায় সুর বাঁধছেন।

মনে রাখবেন থাইরয়েডে সুর খারাপ হয় না, হয় চর্চার অভাবে। এক মনোবিদের কথা ধার করে বলি, নিজেকে আয়নার মতো রাখুন। আপনি অপরের কাছ থেকে যে ব্যবহার পাবেন বদলে তাই করুন। যে আপনার কাছে সবথেকে খারাপ তার সঙ্গে আরও খারাপ ব্যবহার করুন। যেমন আচরণ করবে মেনে না নিয়ে পালটা একই আচরণ করুন। দেখবেন অনেক গ্লানি ঝরে গিয়েছে। ধৈর্য ধরে একবার চেষ্টা করুন। বিশ্বাস রাখুন, আর একবার হারমোনিয়াম হাতে নিন, কলম সাদা কাগজ টেনে নিন, সেই প্রিয় লেখকের লেখা আবার পড়ুন, স্কুল কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হোক। নতুন রান্না শেয়ার চলুক, জেনেবুঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক বন্ধু করুন। টবের গাছগুলোতে জল-সার দিন। সঙ্গে থাক সাধ্যমতো শরীরচর্চা। মনে রাখুন বয়েস একটা সংখ্যা মাত্র। অনেক ভালো থাকবেন একটু আধ্যাত্মিক জগতের সংস্পর্শে এলে। সামান্য সময়ের জন্য হলেও ধর্মগ্রন্থে মন দিন। স্বামী, সন্তান, আত্মীয়, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অপমান পেলে পালটা রাগারাগি নয়, অভদ্র আচরণ নয়। তবে নিজেকে কঠিন আবরণে রেখে বুঝিয়ে দেওয়া আপনি নিজেকে তৈরি করেছেন। যুদ্ধ নয় কিন্তু আত্মসমর্পণও নয়। আবার শারীরিক ব্যাধি উপেক্ষা নয়। নিজের মতো থাকুন দেখবেন ওষুধ কমে যাচ্ছে। আর মনোবিদ, তিনি আপনার কাছে গান শিখছেন। নিজের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, হবেই। ▯

সবসময় মেজাজ খারাপ থাকা একটি রোগ

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

অনেকেরই মেজাজ বা মুড খারাপ থাকে নানা কারণে। কিন্তু যদি কারও সবসময় মেজাজ খারাপ থাকে, তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ অতি আবশ্যক। রিডার্স ডাইজেস্ট সবসময় খারাপ মেজাজের কিছু মেডিক্যাল কারণ বাছাই করেছে, যা এ ধরনের সমস্যার কারণ শনাক্ত করতে সাহায্য করার পাশাপাশি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মনকে শান্ত রাখার উপযোগী। কারণগুলি নীচে উল্লেখ করা হলো—

থাইরয়েড হরমোন : মহিলাদের ক্ষেত্রে থাইরয়েড হরমোন বেড়ে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার। এতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির গলায় প্রজাপতি আকৃতির গ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে অত্যধিক পরিমাণ হরমোন নিঃসৃত হওয়াকে হাইপারথাইরয়েডিজম বলা হয়। চিকিৎসকদের মতে, এটি হতে পারে বাচ্চা এবং অন্যদের প্রতি চিৎকারের কারণে। এ প্রসঙ্গে ইউনিভার্সিটি, হসপিটালস বার্মিংহামের অ্যান্ডোক্রিনোলজিস্ট নিল গিটোজ বলেন, থাইরয়েড হরমোন মেটাবলিজম কিংবা বিপাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবকিছুকে প্রভাবিত করে। ফলে মানুষের অস্থিরতা, নার্ভাসনেস এবং মনোযোগহীনতাও বৃদ্ধি করতে পারে।

শর্করা : মেডিক্যাল বিবৃতি অনুযায়ী, পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত শর্করা রিসিভ না হলেও কোনও মানুষের রাগ বা বিরক্তি বাড়ে। আরও বলা হয় যে, শর্করার মাত্রায় ঘাটতি ব্রেনে সেরোটোনিনের মতো কেমিক্যালের ভারসাম্যহীনতা ঘটায়। ফলে মানুষকে উত্তেজনা ক্রোধ, কনফিউশন ও প্যানিক অ্যাটাকের দিকে চালিত করে।

প্রমেন্সটুয়্যাল সিন্ড্রোম : এটি হচ্ছে মহিলাদের জন্য বিরক্তিকর একটি বিষয়। ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টরনের মতো হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে মহিলারা অধিক খিটখিটে হয় এবং তাঁদের রাগ কিংবা বিরক্তি বৃদ্ধি পায়।

দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা : খিটখিটে স্বভাবের আরও একটি কারণ হলো দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা। এ বিষয়ে অ্যানিটা গার্ডিয়া স্মিথ নামক একজন সাইকোথেরাপিস্ট বলেন, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা নিয়ে বাস করা লোকেরা সবসময় অস্বস্তিকর ও বেসামাল অবস্থায় থাকে। শুধু তাই নয়, অপিডইড পেইনকিলারের মতো কিছু মেডিসিনের প্রতিক্রিয়াতেও অনেকের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যেতে পারে।

শারীরিক অসুবিধা : শারীরিক অসুবিধা মেজাজ খারাপ হওয়ার জন্য আর একটি কারণ। এ ব্যাপারে নিউইয়র্ক সিটির সাইকোথেরাপিস্ট কারেন এ ডোয়াইয়ার টেসোরিয়োরো উল্লেখ করেন, শারীরিক ব্যথা বা অস্বস্তি অথবা অসুবিধা মানুষকে খিটখিটে স্বভাবের দিকে ধাবিত করে। এমনকী শারীরিক অসুবিধার মধ্যে আছে পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া, ক্ষুধার্ত হওয়া ও স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি অনীহা। তাই মেজাজকে উন্নত করতে দিনের প্রধান প্রধান খাবারের মাঝখানে হালকা খাবার খাওয়া দরকার এবং বেশি করে ব্যায়াম করা জরুরি।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা : যদি কারও মেজাজ তাঁদের বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব কিংবা সহকর্মীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে খারাপ প্রভাব ফেলে, তাহলে তাঁকে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। প্রায় ক্ষেত্রেই একজন লোক যখন রাগ অনুভব করেন, তাঁরা বাহ্যিক উদ্দীপক বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেন না, যা তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য বা অপরাধমূলক অভ্যন্তরীণ অনুভূতি সৃষ্টি করে।

শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা : এই সমস্যা নিয়ে ডোয়াইয়ার টেসোরিয়েরো উল্লেখ করেন, মাথা ক্লিয়ার করা এবং অল্প হাঁটা উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা কমাতে সহায়ক। সুতরাং যাঁদের এই সমস্যা আছে, তাঁরা যে কোনও এক্সারসাইজ রুটিন মেনে করার পূর্বে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। কারণ ব্যায়াম, আশপাশে ঘোরা কিংবা লোকাল পার্কে হাঁটার এবং প্রকৃতির সান্নিধ্য মেজাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

ভিটামিন ডি ঘাটতি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়ার স্টেটের কাইরোপ্র্যাক্টর স্কটড স্ক্রিবার বলেন, যদি কোনও ব্যক্তি দিনের বেলায় ঘরে অবস্থান করেন এবং কেবলমাত্র রাতে বাইরে বের হন, তাহলে তাঁর শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তিনি আরও বলেন, ভিটামিন ডি ঘাটতির সমস্যা খুব কমন।

এই সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সঙ্গে জড়িত আছে বিষণ্ণতা। এছাড়া অধিক রাত পর্যন্ত বাইরে অবস্থান করলে সার্কাডিয়ান রিদম ব্যাহত হয়, ফলে ঘুসের সমস্যা ছাড়াও আক্রান্ত ব্যক্তির সবসময় বিমর্ষ অথবা মনমরা ভাব থাকা সম্ভবপর।

মাননীয়া ভেবেছিলেন ফাউল করলেও রেফারি বাঁশি বাজাবে না

সুজিত রায়

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় নিয়েছে শীত। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রা ঝাঁপিয়ে পড়েছে এ রাজ্যের মাটিতে। সেই উত্তাপের পারদকে আরও কয়েক দাগ চড়িয়ে দিয়েছে দেশের নির্বাচন কমিশন। কমিশন ঘোষণা করে দিয়েছে, ২০২১-এর রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মার্চ মাসের ২৭ তারিখ থেকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে। মোট ৮ দফায়। আর এতেই চটেছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের মালকিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা শুনেই তিনি হুংকার ছেড়েছেন— 'বিজেপির নির্দেশমতো ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। কেরলে ১৪০ বিধানসভার নির্বাচন। সেখানে একদিনে নির্বাচন হবে। তামিলনাড়ুতে ২৩৪ আসনে নির্বাচন। সেখানে একদিনে নির্বাচন হবে। অসমের ১২৬ আসনেও নির্বাচন হবে মাত্র তিনদিনে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে আট দিনে কেন?'

'খেলা হবে খেলা হবে' স্লোগান তুলে যে মুখ্যমন্ত্রী গত একমাস ধরে রাজ্য দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, ইঙ্গিত দিচ্ছেন বীরভূমের জোকার তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের কথা উদ্ধৃত করে— 'খেলা হবে। ভয়ংকর খেলা হবে। রাতে খেলা হবে। দিনে খেলা হবে'। মমতা ব্যানার্জি চড়া মেজাজকে সপ্তমে চড়িয়ে হুংকার দিয়েছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আট দফার নির্বাচন বাঙ্গলা তথা বাঙ্গালির অপমান। অমিত শাহের কথায় ভোটের নির্ঘণ্ট তৈরি হয়েছে, তাঁদের ভোট প্রচারের সুবিধার কথা ভেবে। আমি দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। আমাকে হারাতে গোটা কেন্দ্র নেমে পড়েছে। সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নিয়ে ছক করা হচ্ছে। আমাকে কীভাবে ফেলা যায়।' এখানেই থামেননি। বলেছেন, 'এখানে ২৩ দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড। ২৩ দিনের খেলা খেলবেন তো? আমরা হলাম স্ট্রিট ফাইটার। আপনাদের সব চক্রান্ত ভেঙে দেব। খেলা হবে আটটা পর্যায়ে। হারিয়ে ভূত করে দেব।'

প্রশ্ন হলো, এতে রাগারাগির কী আছে?

ব্যালট বক্স ছিনিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে ভোটলুটেরারা। (ফাইল চিত্র)

গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে একমাত্র উত্তপ্ত রাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ। তামিলনাড়ু বা কেরলে ভোটপর্বে আর্থিক খরচের পরিমাণ বেশি কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেখানে ভোট দিতে পারে। এই কারণেই সেখানে একদিনে ভোট করা সম্ভব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ইতিহাস বলে, গত কয়েক দশকের নির্বাচন প্রমাণ করেছে, এ রাজ্যে একদিনে ভোট করা অসম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রীর এত গোসাঁই বা কেন? বিশেষ করে যখন তিনি জেনেই গেছেন— বিজেপি হেরে ভূত হয়ে যাবে? এ প্রশ্নটার জবাব উনি এখনও দেননি। যেমন দেননি আরও একটা প্রশ্নের উত্তর— 'দিদিমণি, ২০১১-য় একাধিক পর্যায়ে ভোট ঘোষণার দাবি কেন করেছিলেন? সেবার কি তাহলে আপনার নির্দেশেই নির্বাচন কমিশন ১৮ এপ্রিল থেকে ১০ মে-র মধ্যে মোট ছ' দফায় নির্বাচন করেছিলেন?'

পাঠক জানেন, এসব প্রশ্নের জবাব উনি কোনোদিনই দেবেন না। কারণ উত্তরটা উনি জেনেও জানেন না। মেনেও মানেন না। কারণ ওর চরিত্রটাই স্ববিরোধিতায় ভরা।

নিঃসন্দেহে এবারের নির্বাচন এক ব্যতিক্রমী নির্বাচন। কারণ, সত্যিই এত বেশি দফায় এক রাজ্যের নির্বাচন এর আগে আর কোনো রাজ্যেই হয়নি। মার্চ মাসে ২৭ তারিখে যে ভোটদান পর্বের যাত্রা হবে শুরু, তা ১ এপ্রিল, ৬ এপ্রিল, ১০ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল, ২২ এপ্রিল, ২৬ এপ্রিলের বুড়ি ছুঁয়ে গিয়ে থামবে ২৯ এপ্রিলে। এই আটদিনে রাজ্যের মোট ৭,৩২,৯৪,৯৫০ ভোটার ১,০১,৯১৬ বুথে ভোটদান পর্ব সেরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে ২ মে-র জন্য, যে দিনের ফলাফল নির্ধারণ করে দেবে মানুষ সত্যিসত্যিই এক আমূল এবং প্রকৃত পরিবর্তনের যাত্রায় পা মেলালো কিনা। প্রকৃত উন্নয়নের মেগা রোড শো'য়ে শামিল হলো কিনা এবং দীর্ঘ ৪৪ বছর পর পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধিতার লজ্জাজনক ইতিহাসকে ভুলে কেন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি ডবল ইঞ্জিন বিশিষ্ট সরকার গঠন করতে পারল কিনা। সে সম্ভাবনা যে প্রবল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এখন সে

প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। আমরা বরং আসি সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে— নির্বাচন কমিশন এ রাজ্যে কেন আট দফায় নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিল? আর কেনই দিদির সর্বশরীর এবং মন চিড়বিড়িয়ে উঠল। একটু পিছন দিকে ফেরা যাক।

২০১১ সালের এ রাজ্যের বিধানসভা ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল মোট ছ' দফায়। এই সিদ্ধান্তের পিছনে মূল কারণ ছিল— রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের জনগণের তীব্র ক্ষোভ। যে জনগণের অভিযোগ ছিল— ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্ট এ রাজ্যে মানুষকে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেয়নি। ভোট লুট হয়েছে। রিগিং হয়েছে। ছাপ্পা ভোট মারা হয়েছে। জাল ভোটারকে দিয়ে ভোট দেওয়ানো হয়েছে। প্রতিবাদ করলেই মানুষকে খুন করা হয়েছে। বাড়ি ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। মারধোর করা হয়েছে মহিলাদেরও। অস্বীকার করার উপায় নেই— জনগণের এই অভিযোগগুলি ছিল অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সেই সঙ্গে ভয়ংকরভাবে উত্থান হয়েছিল মাওবাদী শক্তির যাদের মূল শক্তির উৎস ছিল বন্দুকের নল। এমতাবস্থায় সে সময়কার প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল এবং নেত্রী মমতাই দাবি করেছিলেন, নির্বিঘ্নে ভোটদান সমাধা করতে হলে একাধিক দফায় নির্বাচন করতে হবে। হয়েও ছিল তাই। এতে মানুষ অন্যায়ের কিছু দেখেনি। যদিও বামদলগুলি আজকের মমতার মতো সেদিনও নির্বাচন কমিশনকে অপমান করতে ছাড়েনি।

এবারের পরিস্থিতি আরও খারাপ। নির্বাচন কমিশনের মতে, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে একমাত্র উত্তপ্ত রাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ। তামিলনাড়ু বা কেরলে ভোটপর্বে আর্থিক খরচের পরিমাণ বেশি কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেখানে ভোট দিতে পারে। এই কারণেই সেখানে একদিনে ভোট করা সম্ভব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ইতিহাস বলে, গত কয়েক দশকের নির্বাচন প্রমাণ করেছে, এ রাজ্যে একদিনে ভোট করা অসম্ভব।

কেন অসম্ভব? কারণ একদিনে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট করতে হলে এ রাজ্যে যে পরিমাণ নিরাপত্তা কর্মী প্রয়োজন তা জোগাড় করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এবারে এ রাজ্যের নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে ২ শতাংশ। কিন্তু কোভিড সংক্রমণ রুখতে নির্বাচনী বুথের সংখ্যা বেড়েছে ১.৬৫ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবে বুথের সংখ্যা বেড়েছে। হিসেবমতো প্রতিটা পর্যায়ে নতুন বুথের সংখ্যা বাড়ছে গড়ে ১২০০। এত বুথে ৫ লক্ষ ভোটকর্মী এবং ১০০০ কোম্পানি নিরাপত্তা কর্মী লাগবে। তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বিঘ্নে কাজ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ রাখতে হবে। এসবের জন্য বাড়তি সময়ের প্রয়োজন। এখানে মনে রাখা দরকার, ২০১৬-র নির্বাচনও হয়েছিল সাত দফায়। কারণ ভোটারের সংখ্যা বেড়েছিল সেবারও। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রেগে আগুন তেলে বেগুন' হয়ে ওঠার কারণ কী? কারণ, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত নানা দিক থেকে তাঁর বহুদিন ধরে সযত্নে লালিত পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিয়েছে।

প্রথমত, তিনি দেখেছেন, সাধারণ ভোট প্রথম দিকে হয় উত্তরবঙ্গে। সেখান থেকে ক্রমশ দক্ষিণবঙ্গের দিকে এগোতে থাকে। উনি ঘুঁটি সাজিয়েছিলেন সেভাবেই। বুথ দখল থেকে ছাপ্পা ভোট, ভোটের প্রচার— সব কিছুই। কিন্তু এবারের প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন হবে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায়। অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের একাংশে যেখানে এবারের নির্বাচনে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী

ভোটের দিনে পশ্চিমবঙ্গে এই চিত্র খুবই পরিচিত। (ফাইলচিত্র)

সন্ত্রাসের সম্ভাবনা প্রবল। এই অঞ্চলের একাংশে জঙ্গলমহল এবং মাওবাদীদের অধিষ্ঠান যারা ২০১১ ও ২০১৬-র নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট হিসেবে এলাকায় সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়। গত ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে অবশ্য এখনকার ভিন্ন রাজনৈতিক চিত্র ধরা পড়েছিল। জঙ্গলমহলের মানুষ সেবারই প্রথম উজাড়হস্তে ভোট দিয়েছিল বিজেপিকে।

মমতার রাগারাগির দ্বিতীয় কারণ হলো, বাঁকুড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব বর্ধমান জেলাকে একাধিক বিভাগে ভাগ করে বিভিন্ন পর্যায়ে ভোটগ্রণের সিদ্ধান্ত। এমন সিদ্ধান্ত এর আগে কখনও নেওয়া হয়নি সম্ভবত। এই জেলা ও অঞ্চলগুলির বেশিরভাগই ছিল তৃণমূলের দখলে। সবটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নয়, তা বলাই বাহুল্য। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে সেই পরিস্থিতির অনেকটা বদল ঘটেছে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস চেষ্টা করবে এবারের নির্বাচনে এসব অঞ্চলে শেষ কামড় বসাতে। অর্থাৎ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কায়েম করতে। নির্বাচন কমিশন তাই বার বার ওইসব অঞ্চল পরিদর্শন করে একাধিক দিনে নির্বাচনের পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আবার তিনটি পর্যায়ে ভোট নেওয়া

বিরোধী দলের কর্মীদের এভাবেই মেরে রক্তাক্ত করার ঘটনা চলে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। (ফাইল চিত্র)

হবে। যেখানে এখন একছত্র রাজনৈতিক আধিপত্য মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির অনেক অভিযোগ উঠেছিল। বিশেষ করে হিন্দুদের ভোটদানে বাধাদানের ব্যাপারে কিছু ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন চায়নি, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আবার ঘটুক। মমতার রাগের কারণ, নির্বাচনী খেলার পরিকল্পনা এখানেও ভেস্তে যাওয়ায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত উত্তেজিত হয়ে ওঠার পিছনে তৃতীয় কারণটি হলো : 'মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ' প্রক্রিয়ায় নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিকে নির্ধারণ করার পরিকল্পনা। নির্বাচন কমিশন এমনভাবে পর্যায়গুলিকে ভাগ করেছে, তাতে একই দিনে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক পরিবেশের মানুষ একসঙ্গে ভোট দিতে পারেন। কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় যাতে অগ্রাধিকার না পায়। এর ফলে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুখ্যমন্ত্রী এতদিন যেমন উন্নয়নের নামে জনবিভক্তিকরণের খেলা খেলতেন। (উদাহরণ : গোর্খা উন্নয়ন বোর্ড, লেপচা উন্নয়ন বোর্ড, সাঁওতাল উন্নয়ন পর্ষদ ইত্যাদি) এবার আর সেই খেলা খেলতে পারবেন না। রাগ তো হবেই। জনতাকে যদি বিচ্ছিন্ন না করা যায় তাহলে ওর রাজনীতিটাই তো বেকার হয়ে যাবে।

রাগারাগির চতুর্থ কারণ, দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ভোটপর্ব ঘোষণা হওয়ায় সুবিধা পাবে সবচেয়ে বেশি বিজেপি। কারণ বিজেপির অনেক নেতা বিভিন্ন রাজ্য থেকে দলে দলে আসছেন পশ্চিমবঙ্গে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রীরা আসছেন বারে বারে। সর্বোপরি যাঁর নামে সেই বিখ্যাত স্লোগান— 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'— সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী বারে বারে আসছেন। আসবেনও যতদিন না ভোটপর্ব সাঙ্গ হয়। আর মোদীর মতো ভোট-ক্যাচার ক'জন আছেন! পশ্চিমবঙ্গকে এবার বিজেপি পাখির চোখ করে এগোচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সেই সুবিধা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দলে একমেবাদ্বিতীয়ম্। ২৩ বছর ধরে তিনি দলের কোনো নেতা-নেত্রীকে সম্মান দেননি। মন্ত্রীদের চাকর-বাকর বানিয়ে রেখেছেন। দলীয় নেতারা অপমানিত হয়েছেন পদে পদে। নতুন নেতা তৈরি হয়নি, নিজের ভাইপোকে তুলে ধরার জন্য বাকি সকলকে ডাস্টবিনে ছুঁড়েছেন তিনি। তাই আজ দল ভাঙছে গঙ্গার পাড়ের মতো। সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরও আজ ঘুম ভেঙেছে। মমতা বুঝতে পেরেছেন, তাদের নিয়ে খেলতে গিয়ে সেমসাইড গোল করে ফেলেছেন। এবার সংখ্যালঘু ভোট আর তাঁর ভোটব্যাঙ্ক নয়। সবকিছু সামলাতে হচ্ছে একা তাঁকে। তাই এই ৬৫ বছর বয়সেও তাঁকে গোটা রাজ্য চষে ফেলে বলতে হচ্ছে— '২৯৪টা কেন্দ্রেই আমি প্রার্থী। আপনারা আমায় ভোট দিন।' তীব্র মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং কায়িক পরিশ্রমের চাপে উনি মেজাজ হারাচ্ছেন। প্রকাশ্য জনসভায় সাধারণ মানুষকে অপমান করছেন। হুমকি দিচ্ছেন। তাল সামলাতে পারছেন না।

স্বয়ং ব্রহ্মাস্বরূপ ৫০০ কোটি টাকা দিয়ে যাঁকে কিনে এনেছিলেন সামালদার হিসেবে সেই প্রশান্ত কিশোরও ফেল। তাই 'দিদিকে বলো', 'দুয়ারে সরকার', 'পাড়ায় সমাধান'— দুদিন অন্তর এক একটা চটকদার স্লোগানসর্বস্ব প্রকল্প হাজির করেও জনগণের মগজ ধোলাই করতে পারছেন না। সবাই বুঝে গেছে— মানুষকে ভিখারি বানানোর নাটক করে তাদের পরমপ্রিয় দিদি আজ যতই নতুন স্লোগান আনুন--- 'পশ্চিমবঙ্গের ঘরের মেয়ে মমতা', তাতে চিঁড়ে ভিজবে না। কারণ 'সততার প্রতীক দিদি' আজ মানুষের চোখে শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই প্রবল দুশ্চিন্তাকে মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের অত্যন্ত সুচিন্তিত সিদ্ধান্তগুলি। বোঝাই যায়, নির্বাচন কমিশন গত পাঁচ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন সম্বন্ধে রীতিমতো অ্যাকাডেমিক গবেষণার কাজ চালিয়ে গিয়েই এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে। বামফ্রন্ট ৩৪ বছর ধরে ভোট নিয়ে খেলে আজ কর্পূরের মতো উবে যাওয়ার মুখে সংখ্যালঘু নেতা আব্বাস সিদ্দিকিকে আঁকড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। আর দিদি দিন গুনছেন— 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে।'

রাগ হবে না? এতদিন তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অধিকার নিয়ে নির্বাচন কমিশন মাথা ঘামায়নি। এখন কেন তাঁদের এত মাথাব্যথা? বোঝেননি, খেলার মাঠে রেফারিও থাকে। একা গোল করে যাবেন ফাউল করলেও আর রেফারি বাঁশি বাজাবে না, তা কী করে হয় বলুন! এবার একটু ঘাড় ঘোরান দিদি, দেখুন আপনার ব্রহ্মা প্রশান্ত কিশোরও তাকিয়ে আছেন, গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছেন পঞ্জাবের দিকে। ডাক পড়েছে। আরও ৫০০ কোটি। কিংবা তারও বেশি। পশ্চিমবঙ্গে নজর দেবেন? সময় কোথায় তাঁর? তিনিও বুঝে গেছেন, এবার হবে ভোটাধিকার ফেরানোর খেলা। নির্বাচন ময়দানে সেজেগুজে হাজির সতর্ক রেফারি নির্বাচন কমিশন। ▮

পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় বিধানসভা নির্বাচন

শাসকদল এত আতঙ্কিত কেন?

বিমল শঙ্কর নন্দ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ কিংবা রাজনীতি সচেতন মানুষ সকলের কাছেই নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসব শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। উৎসবে মানুষ অংশ নেয় আনন্দের সঙ্গে। নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালকদের বেছে নেয়। পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনসাধারণের এটাই সবচেয়ে বড়ো ক্ষমতা। একারণেই অবাধ এবং মুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রধান পূর্বশর্ত বলে মনে করা হয়। নির্বাচনী ব্যবস্থা হিংসা এবং দুর্নীতির আবর্তে নিমজ্জিত হলে গণতান্ত্রিক কাঠামোই বিপদের মুখে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৭ মার্চ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত মোট আট দফায় পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনের হিসেব অনুযায়ী ৮৩২,৯৪,৯৬০ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তাঁদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করতে। ৮ দফায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয়েছে (কিংবা বলা ভালো শুরু করা হয়েছে) এক নতুন বিতর্ক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ-সহ চারটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরীতে (পূর্বতন পণ্ডিচেরী) যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কোথাও ৮ দফায় নির্বাচন হচ্ছে না। তামিলনাড়ু, কেরল ও পুদুচেরীতে মাত্র এক দফায় এবং অসমে তিন দফাতেই বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হবে ৮ দফায় যা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাসে একটি নজির। বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কমিশনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা। ২০১৬ সালেও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল ৭ দফায়। নিরাপত্তা বাহিনীর স্থানান্তর, ভয়মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই এবার ৮ দফায় নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ নির্বাচন কমিশনের কড়া মনোভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও বাঙ্গলার দ্বন্দ্বমূলক রাজনীতির চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে ভিন্ন সুরও শোনা যাচ্ছে। কিছুটা উচ্চগ্রামে তাঁর স্বরটিকে তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ এই নির্বাচনী নির্ঘণ্ট বিজেপিকেই

৮ দফায় নির্বাচন, কেন্দ্রীয় বহিনী দিয়ে নির্বাচন করানোর সিদ্ধান্ত। এতে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের আপত্তির কারণ কী? তারা কি ভয় পাচ্ছে অবাধ নির্বাচন হলে ২০১১ সালের মতোই মানুষ পরিবর্তনের পথে হাঁটবে?

শাসক দলের কর্মীদের নির্দেশে চলছে ভোটদান।

নাকি সুবিধা দেবে। তাঁর প্রশ্ন, অন্য রাজ্যে যেখানে নির্বাচন হচ্ছে মাত্র এক দফায় সেখানে কেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন এতগুলি দফায় অনুষ্ঠিত হবে? এমনকী দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জেলাতেও বিধানসভার কেন্দ্রগুলিতে তিন দফায় নির্বাচন হবে। যেহেতু দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূলের শক্ত 'ঘাঁটি' তাই এই দলকে সমস্যায় ফেলতেই নাকি এই ধরনের সিদ্ধান্ত।

ভারতে সাত দশকের গণতন্ত্রের ইতিহাস নিঃসন্দেহে এক সাফল্যের ইতিহাস। নানা ক্ষেত্র থেকে এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর আঘাত এলেও সাফল্যের সঙ্গে তার মোকাবিলা করে ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিরোপা নিয়ে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে বিগত শতাব্দীর ৯০-এর দশক থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছর নির্বাচনী হিংসা এবং হানাহানি গোটা ভারতের রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগ সৃষ্টি করলেও মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার শক্ত হাতে বিশৃঙ্খলা দমন করে রাজ্যে সুস্থ আইনব্যবস্থা অনেকটাই প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। বিহারে নির্বাচনী হিংসা এখন অতীত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে পশ্চিমবঙ্গের সমাজে রাজনৈতিক হিংসা বিশেষত নির্বাচনী হিংসা এখন গোটা দেশে আলোচনার বস্তু। কারণ এ এক ভয়ংকর বাস্তব। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর গড়ে ২০টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। ১৯৪৬-৪৮ সালের তেভাগা আন্দোলন, ১৯৫৯ সালে এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭-৭০-এর নকশাল আন্দোলন— প্রতিটি আন্দোলনই পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতিতে হিংসার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। সমাজে হিংসার উপস্থিতি থাকলে নির্বাচনী রাজনীতিও তার বাইরে থাকতে পারে না। ১৯৬৭ সালের নির্বাচন পর্যন্ত এ রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হিংসার উপস্থিতি থাকলেও তা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ভয়ংকরভাবে কলুষিত করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকেই এ রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ক্রমেই হিংসা ও দুর্নীতিতে দীর্ণ হতে শুরু করে। ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রিগিং এবং

এভাবেই বুথ দখলের চেষ্টা রুখতে ব্যস্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

এভাবেই অবাধে মানুষের ভোটাধিকার হরণের চেষ্টা হচ্ছে

জালভোট ও বুথ দখলের অভিযোগ ওঠে। এর প্রতিবাদে সিপিআইএম (এম) বিধানসভার নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায় এবং ওই দলের নির্বাচিত প্রার্থীরা পাঁচবছর বিধানসভাতেই যাননি। এটা সত্যি যে ১৯৭২ সালের নির্বাচনে নব কংগ্রেস কর্মীরা বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে রিগিং বা বুধ দখল ও জাল ভোটের আশ্রয় নিয়েছিল। এর মধ্যে ছিল উত্তর শহরতলির বরানগর কেন্দ্র যেখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বাম নেতা জ্যোতি বসু। কিন্তু এই ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে সিপিআই (এম) বিধানসভা বয়কট করে এবং পরবর্তীকালের রাজনৈতিক আলোচনা কিংবা বিশ্লেষণে বাম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিকরা ১৯৭২ সালের নির্বাচনকে নির্বাচনী প্রহসনের প্রধান উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতেন এবং জনগণের চোখে তাঁদের ভাবনাকে প্রকৃত সত্য বলে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বুথ দখল ও রিগিং হলেও তা হয়েছিল অল্প কিছু বাছাই করা কেন্দ্রে। যাইহোক, ১৯৭২ সাল পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই অধ্যায় হলো নির্বাচনে হিংসা ও জালিয়াতির এক কদর্য অধ্যায়। ইতিহাসের পরিহাস হলো, যে সিপিআই (এম) ১৯৭২ সালের নির্বাচন থেকে দলকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল দুর্নীতি ও হিংসার অভিযোগ তুলে, সেই দলই ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনে দুর্নীতি, হিংসা ও জালিয়াতির এক নতুন ঐতিহ্যের সূচনা করে। লক্ষ্য ছিল একটাই, যেভাবেই হোক ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে 'পার্টি' যাতে সরে না যায় তা নিশ্চিত করা। এভাবেই কায়েমি স্বার্থের সবচেয়ে বড়ো সমালোচক সিপিআই (এম) নিজেই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড়ো কায়েমি স্বার্থের ধারক ও বাহক।

১৯৮২ সালের নির্বাচন থেকে এরাজ্যে সিপিআই (এম) বিরোধী দলগুলি হিংসা ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের জন্য দাবি জানিয়েছে, এই দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন পরিচালনা করেছে। বিগত শতাব্দীর ৮০-এর দশকের শেষের দিক থেকে এই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনে ফোটো-সহ পরিচয়পত্র চালুর দাবিতে ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মহাকরণ অভিযান আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়। পুরোনো খবরের কাগজের পাতাগুলো একটু উলটে দেখলেই বোঝা যাবে এ রাজ্যের নির্বাচনে সিপিআই (এম) ক্যাডারদের দাপাদাপি বন্ধ করতে বিরোধী নেতার বিশেষত তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নানা দাবি করেছেন। ফোটো-সহ পরিচয়পত্র চালু করা ছাড়াও কেন্দ্রের আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে নির্বাচনে শান্তি রক্ষা। একাধিক পর্যায়ে নির্বাচন করা প্রভৃতি নানা দাবি উঠে এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি ছিল গোটা নির্বাচনে শান্তিরক্ষা ও হিংসা প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করতে হবে এবং একাধিক পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে যাতে তৎকালীন শাসক সিপিআই (এম) দুর্নীতি ও হিংসা প্রয়োগের সুযোগ না পায়। নির্বাচন কমিশনের কঠোর পদক্ষেপে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেছে এক সত্যিকারের শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। ৩৪ বছর পর সিপিআই (এম) গদিচ্যুত হয়।

সিপিআই (এম)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেসের স্লোগান ছিল এক দুর্নীতিমুক্ত, হিংসামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা, নির্বাচনী ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি ও হিংসা দূর করা। কিন্তু এ রাজ্যের মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এই দল রাখেনি। গত ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার ঘটনা এক নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। ৩৪ শতাংশ মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। তাই ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। এ কারণেই ৮ দফায় নির্বাচন, কেন্দ্রীয় বহিনী দিয়ে নির্বাচন করানোর সিদ্ধান্ত। এতে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের আপত্তির কারণ কী? তারা কি ভয় পাচ্ছে অবাধ নির্বাচন হলে ২০১১ সালের মতোই মানুষ পরিবর্তনের পথে হাঁটবে? পরিবর্তন গণতন্ত্রের এক বৈশিষ্ট্য। তাকে মানতেই হবে।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কোনো পদক্ষেপ করেনি

তরুণ পণ্ডিত

উত্তরবঙ্গের আপামর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূমিকা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। লাগামছাড়া সন্ত্রাস, বাংলাদেশ সীমান্তে জেহাদি সংগঠনের বাড়বাড়ন্ত, নারী নির্যাতন, গো-পাচার, অপরাধ জগতের মাথাচাড়া দেওয়া ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি উত্তরবঙ্গকে ক্রমশ পেছন দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রাজ্যের শাসকদলের মদতে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে যেভাবে ট্রেন, স্টেশন ভাঙচুর, ট্রেন লাইন উপড়ে ফেলা, ট্রেন, বাসে অগ্নিসংযোগ-সহ সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে তা এককথায় নজিরবিহীন। আবার সেই রেল স্টেশনেই যখন রাজ্যের মন্ত্রীর উপরে দুষ্কৃতীরা বোমা মেরে হামলা করে তখন তার জন্য নির্লজ্জের মতো কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষারোপ করা হয়। ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে এক সম্প্রদায়ের মানুষদের লাগামহীন তোষণে সৃষ্ট সন্ত্রাসের ভয়াবহতা বঙ্গবাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। কয়েক বছর আগে মালদার কালিয়াচকে কয়েক হাজার জেহাদিদের দ্বারা থানা আক্রমণ, থানা লুটপাট করে এবং জ্বালিয়ে দেওয়া এবং জোর করে জমি দখল করার ঘটনাগুলি হিন্দুদের অসহায়তার কথা মনে করিয়ে দেয়।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা ও বিজ্ঞান শিক্ষকের পরিবর্তে উর্দু শিক্ষক নিয়োগের প্রতিবাদে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে রাজেশ ও তাপস নামের দুইছাত্র। এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিল মৃত

রাজেশ ও তাপসের পরিবার। কিন্তু তাদের সেই দাবি আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি, তাঁরা সুবিচার পাননি। আসলে দাড়িভিটের ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। ইসলামিক আগ্রাসনের যে ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এই রাজ্যে প্রায় এক দশক ধরে চলছে, এই নারকীয় ঘটনা তারই একটি অঙ্গমাত্র।

একই ভাবে লাভ জেহাদের ঘটনা সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়েই রয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা জেহাদিদের পক্ষে কাজ করে। লকডাউনের সময়ে মহরমের শোভাযাত্রায় সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে মালদার চাঁচলে ৬-৭ হাজার মানুষের মিছিলের অনুমতি দেওয়া তোষণের এক জলন্ত উদাহরণ। শিক্ষাঙ্গনে ৫০ শতাংশ নম্বর না থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের ১০০ শতাংশ ছাত্রবৃত্তি দিয়ে জনগণের ট্যাক্সের কয়েকশো কোটি টাকা খরচ তোষণের আর একটি প্রমাণ। এছাড়াও চাকরিতে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ, পড়াশোনার জন্য অনুদান-সহ দুই ডজন সুযোগসুবিধা দিয়ে দরিদ্র দলিত ও তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের আর্থিক দিক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নারী নির্যাতনেও এরাজ্য পিছিয়ে নেই। দক্ষিণ দিনাজপুরের জবা রায় কিংবা মালদার জনজাতি মহিলাকে পুড়িয়ে মারার মতো বেশকিছু ঘটনা নারী নিরাপত্তার অভাবকেই প্রকট করেছে।

উত্তরবঙ্গে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য কোনো শিল্পের ব্যবস্থা না থাকায় তারা বাড়ি ছেড়ে ভিন রাজ্যে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে ঢালাও মদের দোকানের লইসেন্স দিয়ে যুবক, কৃষক ও শ্রমিকদের নেশার মধ্যে রেখে তাদের পরিবারগুলোকে আর্থিক ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক পিছিয়ে পড়া ও অনুন্নত এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর। এখানে বিপুল পরিমাণে আলু, আনারস ও আম উৎপন্ন হয়। অথচ প্রক্রিয়াকরণের অভাবে বা পচন থেকে রক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে হিমঘর নেই। ফলে চাষিরা কৃষিকাজ করে লাভের মুখ দেখতে পান না। আরও কয়েকটি সমস্যা পশ্চিমবঙ্গকে ক্রমশ ভাবিয়ে তুলেছে। সেগুলো হলো জাল নোট ও গোরুপাচার। সম্প্রতি এনামুল হককে সিবিআই গ্রেপ্তার করে তার কাছে থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে। একসময়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি পদে থাকাকালীন নপরাজিত মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রকে জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ ভারতে আইএসআই-এর মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ জালটাকা পাঠায় তার ৮০ শতাংশ আসে মালদা জেলার কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগরের ১৯ কিলোমিটার খোলা সীমান্ত দিয়ে। এছাড়াও প্রশাসনের নাকের ডগায় কালিয়াচকে হাজার হাজার বিঘা জমিতে বেআইনি পোস্ত চাষ হয়ে থাকে যা পরবর্তীকালে নেশার বস্তু তৈরি হয়ে যুবসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এতে রাজ্য প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের জন্য ১৮০০ ঘর তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে হতভাগ্য পাঁচ লক্ষ চা-শ্রমিকদের দুর্দশা দূর করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। রাজ্য সরকার ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখে নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও উত্তরবঙ্গের মানুষের উন্নতির কোনো চেষ্টা করেনি। *(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)*

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রাদেশিক সমিতির সভা

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রাদেশিক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার ৮৪ নং সঙ্ঘ কার্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সভাপতি আশিস মণ্ডল ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর।

প্রাদেশিক সমিতির কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে সরস্বতী বন্দনা দিয়ে সভা শুরু হয়। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সংগঠনের বিকাশ ভবন অভিযান কার্যক্রম সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য মহেন্দ্রজী সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সংগঠনের বিভিন্ন দিক আলোচনার পর বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রকাশিত সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক উন্মোচন করা হয়।

অরুণাচলে সীমান্ত দর্শন যাত্রা-২০২১

অরুণাচল বিকাশ পরিষদ আদতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলেও অরুণাচল প্রদেশের সার্বিক বিকাশের কাজ করে চলেছে। পরিষদের লক্ষ্য, অরুণাচল প্রদেশের মানুষের পরম্পরাগত বিশ্বাস, সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও দেশাত্মবোধের ভাবনার বিকাশ। পরিষদের উদ্যোগে গত ২৩ থকে ২৬ জানুয়ারি ৭২ তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে মায়ানমার, ভুটান ও চীন সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে 'সীমান্ত দর্শন যাত্রা-২০২১'-এর আয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য, রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বসবাসকারী ভাই-বোনেদের সঙ্গে ভাব সম্মিলন। যাত্রার শুভ সূচনা করেন অরুণাচলের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী চওনা মেন। ১২টি জেলার ১১টি গ্রাম ও ২৫টি প্রশাসনিক এলাকা পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমায় বনবাসী সমাজের ১৭টি গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ৩৫টি সেনাশিবিরেও যান যাত্রীরা। ৪১টি সীমান্তবর্তী গ্রামে তাঁরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

দ্বারহাট্টায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রপতি পুস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালক ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের ১১৫ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এক রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয় ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরে। এদিন সকাল ৯টায় পার্শ্ববর্তী রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে তাঁর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে শিবিরের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক বিজয় আঢ্য, প্রবীণ প্রচারক শঙ্কর মিত্র, জেলা প্রচারক রাখহরি গড়াই প্রমুখ।

শিবিরে কলকাতার লায়ন্স ক্লাবের তত্ত্বাবধানে ৪৫ জন রক্ত দান করেন। রাজবলহাট কালচারাল সার্কেলের সহযোগিতায় ৪১ জনের ব্লাড সুগার ও ব্লাড প্রেসার, ২১ জনের ইসিজি এবং ৪১ জনের ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা করা হয়। অর্থোপেডিক চিকিৎসক ডাঃ অরূপ দাস ২০ জনের চিকিৎসা করেন। বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শ্যামল চক্রবর্তী ৮ জন শিশুর চিকিৎসা করেন। বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ এসআর দত্ত ৯১ জনের চক্ষু পরীক্ষা করেন।

সত্য ও শাশ্বতের প্রতীক দেবাদিদেব মহাদেব

রামানুজ গোস্বামী

শিবভক্ত মহাপুরুষ বা মহাত্মাদের কথা আমরা জানি, তাঁদের সকলেই শিবের কৃপায় শিবতত্ত্বের মহিমা সম্যকরূপে অনুভব করেছিলেন। আমরাও যেন দেবাদিদেবের কাছে তাঁর কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা করতে পারি।

শিব একাধারে সাকার আবার নিরাকার। সাকার অর্থাৎ যিনি আকার-আকৃতি সম্পন্ন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, শিবের রূপ কিন্তু দেববিগ্রহ বা শিবলিঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একথা ঠিকই যে, বিগ্রহ বা পটে কিংবা শিবলিঙ্গে আমরা ভগবান শিবের যে রূপ দর্শন করি, তা অবশ্যই মহাদেবের এক একটি রূপ। কিন্তু একথাও ঠিক যে, এই সমুদয় জগতই হলো শিবময়। একথার অর্থ এটাই যে, ভগবান শিবের থেকেই যাবতীয় যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁর দ্বারাই পালিত হয় এবং সব শেষে তাতেই লয় প্রাপ্ত হয়ে যায়। তিনি নিজে এই জগতের আধার ও আধেয় দুইই হয়েছেন। বস্তুত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করে থাকেন। নামে পৃথক হলেও আসলে এঁরা কেউই কিন্তু পৃথক নন। তত্ত্বগত ভাবে এঁরা এক ও অভিন্ন। তাই বলা হয়েছে যে—

'ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা চ ত্বং বিষ্ণুঃ
পরিপালকঃ।
ত্বং শিবঃ শিবদোঽনন্তঃ
সর্বসংহারকারকঃ।।'

দেবতাদের মধ্যে একমাত্র শিবই হলেন 'স্বয়ম্ভু'। তিনিই আদিদেব। অনন্ত জগতে তিনি শান্তির শীতল বারি বর্ষণ করেন, জীবকে সুখ ও আনন্দ প্রদান করেন। সমুদয় দুঃখদুর্দশা দূর করেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সাধককে প্রচণ্ড কঠোরতা অবলম্বন করতেও হয় না। তিনি আশু (সত্বর) প্রসন্ন বা তুষ্ট হয়ে থাকেন। তাই তাঁর অপর নাম আশুতোষ। ভক্ত-সাধকদের কৃপা করবার জন্য তিনি যে সদা-সর্বদাই উৎসুক ও আগ্রহী। তাঁর কাছে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই, নেই শিক্ষিত- অশিক্ষিতের ব্যবধান, নেই ধনী-নির্ধনের তফাতও। সকলের প্রতি শিবের কৃপার দুয়ার সদা-সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে। এই কৃপা লাভ করবার জন্য প্রয়োজন ভক্তি ও শ্রদ্ধার। তবেই সেই ভক্ত শিবের কৃপা লাভ করতে পারে। শিব প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষ মহিমার কথা না বললে চলে না। তা হলো এই যে, দেবতাদের মধ্যে একমাত্র দেবাদিদেব শিবই হলেন ত্রিনয়নের অধিকারী। তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে নির্গত হয় (বলা ভালো যে, বর্ষিত হয়) ভয়ংকর অগ্নি। এই তৃতীয় নয়নের অগ্নির দ্বারাই তিনি

'তব তত্ত্বং ন জানামি কৃদৃশোঽসি
মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায়
নমো নমঃ।।'

দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম জানাই এই বলে যে, 'হে মহেশ্বর, তোমার মহিমময় যে তত্ত্ব, তা আমি কিছুই জানি না। তুমি কেমন, তা আমার জানা নেই। তাই তুমি যেই রূপ বা যেমন, তোমাকে সেই রূপেই প্রণাম জানাই।'

শিব প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে কথাটি না বললেই নয়, তা হলো— 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। এটি দেবাদিদেব প্রসঙ্গে একটি বহুল প্রচলিত উক্তি। এই মহাবিশ্বে যা কিছু সত্য ও শাশ্বত তাই হলেন শিব। অন্যদিকে যা কিছু শিব, তা সবই সুন্দর। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, 'শিব' অর্থে জগতের যাবতীয় পবিত্র, মঙ্গলময় ও কল্যাণকর বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে। তাই যখনই আমরা কোনও সুন্দর, পবিত্র, দিব্যভাব ও গুণাবলী সম্পন্ন এবং কল্যাণময় বস্তু বা বিষয়ের সম্মুখীন হই, তখনই এটা মনে রাখতে হবে যে, শিবই এই সকল রূপে অবস্থান করছেন। তাই, এই সবই হলো শিবেরই এক একটি রূপ ও গুণের প্রকাশ। এই জগতে তিনটি গুণ রয়েছে, তা হলো যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমো। ভগবান শিব একাধারে যেমন এই তিন গুণেরই অধিকারী; আবার অন্যদিকে তিনি ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ তিন গুণেরই অতীত। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। তাই তাঁকে বোঝা বা উপলব্ধি করার এতটুকু সাধ্যও মানুষের নেই। তিনি নিজে কৃপা করে যে ভক্ত বা যে সাধককে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করান বা দর্শন দেন, একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব শিবতত্ত্বের পরম জ্ঞানের উপলব্ধি। জগতের ইতিহাসে যত

মদন-ভস্ম বা কামদেবকে ভস্মীভূত করেছিলেন।

শিব প্রসঙ্গে আলোচনায় এবারে একটু শাস্ত্রের কথায় আসা যাক। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে বেদের প্রসঙ্গ। বেদে রয়েছে শিব তথা রুদ্রের প্রসঙ্গ। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদ এবং উপনিষদ— সর্বত্রই আছে রুদ্র প্রশস্তি। ঋগ্বেদের মতে রুদ্র একদিকে যেমন মহা উগ্র এবং ভয়ংকর, অন্যদিকে তিনি পরম করুণাময়।

'রুদ্' অর্থে রোদন বোঝায়। তিনি সংহারকর্তা। তাই তিনি জীবের রোদনের কারণ। তাই তাঁর নাম রুদ্র। আবার পাশাপাশি তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। তিনি বৈদ্যশ্রেষ্ঠও বটে। একই সঙ্গে তিনি কৃষিকাজ তথা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে থাকেন। আবার এই রুদ্র দেবতাকেই অগ্নিও বলা হয়। প্রসঙ্গত, সামবেদে বলা হয়েছে যে, 'অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে'। উল্লেখ্য যে, অগ্নির যে শক্তি, তাঁকেই এখানে রুদ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। রুদ্র তাঁর ভক্তদের সদাসর্বদাই সকল প্রকার দুঃখদুর্দশা থেকে রক্ষা করে থাকেন। যজুর্বেদেও তাঁকে সর্বব্যাধি-নিবারক বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং এটা বুঝতে কোনও অসুবিধাই হয় না যে, অনেক মূঢ় ব্যক্তি যে শিবকে অনার্যদের দেবতা বা এমনকী বনবাসীদের দ্বারা সেবিত এবং বেদ-বহির্ভূত বলে উল্লেখ করবার চেষ্টা করে থাকে, তাদের বক্তব্য একেবারেই হাস্যকর। শিব চিরদিনই বৈদিক দেবতা এবং বৈদিক যুগ থেকেই ঋষি-মুনিরা তাঁর উপাসনা করেছেন। তিনিই ত্রিশূলধারী ভৈরব এবং এই জগতের অধীশ্বর।

পৌরাণিক যুগে ভগবান শিবের প্রশস্তি নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। শিবকে বলা হয় পঞ্চানন। পঞ্চমুখের নাম হলো যথাক্রমে— ঈশান, অঘোর, বাসদেব, সদ্যোজাত ও তৎপুরুষ। তাঁকে 'সর্বগুণবিভূষিত' বলা হয়েছে। তিনি পশুপতি। তাঁর কৃপাদৃষ্টি থেকে পশুরাও বঞ্চিত হয় না। তাঁর অনুচর তথা সহচর ভূত-প্রেতের দল। রুক্ষ জটাজল, চিতাভস্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, রুদ্রাক্ষ ও চন্দ্রকলা তাঁকে অপরূপ সৌন্দর্যময় করে তুলেছে। তাঁর বিচরণের এক প্রধান ক্ষেত্র হলো শ্মশানভূমি। শিব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে—

'পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং
বসানং বরেণ্যম্।
জটাজুটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গ্যবারিং
মহাদেবমেকং
স্মরামি স্মরারিম্।।'

যিনি শিব, পশুপতি, সমস্ত পাপের নাশ করেন, তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করে থাকেন, যাঁর জটাজালে আবদ্ধ হয়েছেন স্বয়ং সর্বকলুষনাশিনী গঙ্গাদেবী, সেই মহাদেব শঙ্করকে স্মরণ করি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি স্তোত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি শিবভক্তদের একটি অত্যন্ত প্রিয় ও সুপরিচিত স্তোত্র—

'কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসার-সারং
ভূজগেন্দ্রহারং
সদাবসন্তং হৃদয়ারবিন্দে
ৰবং ভবানী সহিতং নমামি।।
কৈলাশপীঠাসন মধ্যসংস্থং
ভক্তৈশ্চ নন্দ্যাদিভিঃ সেব্যমানং
ভক্তার্তিদাবানলমপ্রমেয়ং
ধ্যায়েৎ উমালিঙ্গিত বিশ্বরূপম্।।'

—'কর্পূরের মতো উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ যিনি কৃপায় সাগর করুণাঘন মূর্তি, সমস্ত সংসারের একমাত্র অবলম্বন— বাসুকী নাগ যাঁর কণ্ঠের ভূষণ— তিনিই আমার হৃদয়পদ্মে স্বয়ং দেবী ভবানীর সঙ্গে নিত্য অধিষ্ঠিত হোন। তাঁদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। কৈলাশ পর্বতই যাঁদের পীঠভূমি যেখানে ভক্তশ্রেষ্ঠ নন্দী প্রমুখ সহচর নিত্য তাঁদের সেবায় বিরাজিত, আমাদের সংসার অনলে প্রজ্বলিত দুঃখ কষ্টের সংসারে একমাত্র শান্তিপ্রদাতা দেবী পার্বতী উমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ বিশ্বরূপে বিশ্বেশ্বর। তাই তোমার এই বিশ্ববন্দ্য বিগ্রহদ্বয়কে প্রণাম।'

পৌরাণিক মতে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি প্রসঙ্গে শিবপুরাণে বলা হয়েছে যে, পুরাকালে একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নিজেদের মধ্যে প্রবল বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। কার ক্ষমতা অধিক ও কে কার থেকে বড়ো, এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক ও বিবাদ শুরু হয়। এক সময় তাঁরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হয়ে পড়লেন। এই বিষয়ে লিঙ্গপুরাণে রয়েছে যে—

'বিবাদশমনার্থং চ প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি।
জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্নং আবয়োঃ মধ্য
অদ্ভুতম্।
জ্বালমালা সহস্রাঢ্যং কালানলচয়োপমম্।
ক্ষয়বৃদ্ধি বিনির্মুক্তং আদিমধ্যান্তবর্জিতম্।
অনৌপম্যম্ অনির্দিষ্টম্ অব্যক্তম্
বিশ্বসম্ভবম্।।'

অর্থাৎ, 'তাঁদের সেই যুদ্ধকালে দুজনের মধ্যে এক অদ্ভুত জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হলো। সহস্র শিখা সমুজ্জ্বল প্রলয়কালীন অনলতুল্য আভাময়। কোনো বস্তুর সঙ্গেই তার তুলনা নেই। আদি মধ্য অন্তহীন বিশ্ববীজ অনির্দেশ্য অব্যক্ত সেই ভাস্বর লিঙ্গ চতুর্দিক আলো করে সেখানে আবির্ভূত হলেন।'

এদিকে অকস্মাৎ সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গমূর্তিকে সেই স্থানে আবির্ভূত হতে দেখে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সকলেই বিস্মিত হলেন। ব্রহ্মা নিজের হংস বিমানে করে এঁর ঊর্ধ্বদিকে সন্ধান করতে চললেন। বিষ্ণু বরাহ অবতার রূপ ধারণ করে এঁর নিম্নদিকের সন্ধানে চললেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাঁরা এঁর আদিঅন্ত কিছুই খুঁজে পেলেন না। বিস্মিত হয়ে অতঃপর তাঁরা সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গের সামনে এসে শ্রদ্ধা ভক্তি সহযোগে প্রণাম জানালেন।

তখন সেই লিঙ্গমূর্তির ভিতর থেকে ব্রহ্মবীজ প্রণব ধ্বনিত হতে শুরু করল। এরপর তাঁরা সেই লিঙ্গের যথাক্রমে দক্ষিণ-উত্তর ও মধ্যস্থানে জ্যোতির্ময় অ-উ-ম এই বর্ণত্রয় দর্শন করলেন। ধীরে ধীরে এই জ্যোতির্মণ্ডলে আবির্ভূত হলেন পঞ্চবক্ত্র মহাদেব স্বয়ং। বলা হয়েছে যে—

'বৃষাকপয়ে শর্বায় কর্তে হতে নমোঃ নমঃ
শিবায় শিবরূপায় ব্যাপিনে ব্যোমরূপিণে।
নমো নিধীনাথ পতয়ে লিঙ্গিনে
সিদ্ধরূপিণে
তেজসে তেজসাং ভর্তে নমস্তে
সর্বরূপিণে।।

অতঃপর স্তবদি দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে শিব তখন স্বরূপ ধারণ করে অবস্থান করতে লাগলেন। এই ভাবেই শিবলিঙ্গের সৃষ্টি হয়

এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দ্বারাই তিনি সর্বপ্রথম পূজিত হয়েছিলেন।

আগেই যেকথা বলেছি যে, শিবলিঙ্গ একটি প্রতীক। এর মধ্যে নিহিত আছে অত্যন্ত গূঢ় তাৎপর্য। বলা হয় যে, একদিকে যেমন এটি শিব ও শক্তির অভেদ ভাবনাকে সূচিত করে, তেমনই এটাও বলা হয়েছে যে, আকাশ হলো লিঙ্গ আর পৃথিবী হলেন তাঁর যোনিপীঠ।

শিবলিঙ্গের উপাসনায় ভক্তের সকল কামনা পূরণ হয়ে থাকে। ভক্তকে অদেয় ভগবানের কাছে কিছুই নেই। তাই যুগে যুগে ভারতের কত মুনি-ঋষি, সাধু-মহাপুরুষেরা সাধারণ মানুষকে শিবের উপাসনা করবার উপদেশ দিয়েছেন। শিবময় এই ভারতভূমিতে রয়েছে অগণিত শিবমন্দির। তার মধ্যে আচার্য শঙ্কর দ্বাদশ শিবলিঙ্গকে জ্যোতির্লিঙ্গের রূপে চিহ্নিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থান করেন। জ্যোতির্লিঙ্গসমূহের নাম হলো— বিশ্বনাথ, সোমনাথ, কেদারনাথ, নাগেশ্বর, ভীমাশঙ্কর, ত্র্যম্বকেশ্বর, মল্লিকার্জুন ও রামেশ্বর। উল্লেখ্য যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের পর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে মুক্তির জন্য সেতুবন্ধ রামেশ্বরমে শিবের আরাধনা করেছিলেন। সেই জ্যোতির্লিঙ্গ রামেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ নামে পরিচিত। এছাড়াও ভারতে রয়েছে স্থাপিত শিবলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ইত্যাদি।

শিব ভারত তথা সমস্ত বিশ্বের হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও আরাধ্য দেবতা। একদিকে তিনি আদর্শ গৃহী, আবার অন্যদিকে তিনি পরম ত্যাগী। তিনি যোগীশ্রেষ্ঠও বটে আবার জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। তন্ত্র ও পুরাণের তিনি বক্তা ও ব্যাখ্যাকার। এহেন শিবের মহিমার কথা বলে শেষ করা যায় না। শিবের আরাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হলো শিবরাত্রি। অনেকে এই উৎসবকে মহাশিবরাত্রিও বলে থাকেন। এবারে এই প্রসঙ্গে কিছু বলা যাক। শিবপুরাণে বলা হয়েছে যে— এই শিবরাত্রির দিনে উপবাসী থেকে শিবের আরাধনায় সহজেই মহাদেবের কৃপা লাভ করা যায়। শিব তো বেলপাতা ও গঙ্গাজলেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। ভক্তের ডাকে তিনি একটুতেই সাড়া দেন। তাই হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই কর্তব্য হলো শিবের আরাধনা করা।

দেবাদিদেব শিব প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবুও যথাসাধ্য তাঁর মহিমা প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে আলোচনার চেষ্টা করা হলো। শিবের মাহাত্ম্য ও মহিমা এই ভারতে (তথা সমগ্র বিশ্বেই) যুগ-যুগ ধরে কীর্তিত হয়ে আসছে। ইদানীং কিছু স্বার্থান্বেষী, নীচ মনোভাবাপন্ন এবং সর্বোপরি হিন্দু ধর্মবিদ্বেষী শিব প্রসঙ্গে অশ্লীল উক্তির অবতারণা করছে এবং নানাভাবে শিবলিঙ্গকে কলুষিত করবার কথাও বলছে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার মেকি মুখোশের আড়ালে চলছে সহিষ্ণু হিন্দুকে আঘাত করবার ঘৃণ্য কাজ।

এতে সমাজের একটা অংশের সমর্থনও রয়েছে। কারণ, হিন্দুকে বা হিন্দুধর্মকে আঘাত করলেও সহিষ্ণু হিন্দু কিছু বলে না। কিন্তু হিন্দুদের এবার সচেতন হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। ধর্মের গ্লানি রোধ করাই তো ভগবানের শিক্ষা বা উপদেশ। তাই সমস্ত হিন্দুকে সচেতনতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মরক্ষার্থে কাজ করতে হবে। ভগবান শিবের মহিমা উল্লেখ করে তাই বলা যায় যে—

'অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং
সিন্ধু পাত্রে সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্বী।
লিখতি যদি গৃহিত্বা সারদা সর্বকালং তদপি
তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।'

—সুতরাং দেবাদিবে শিবের মহিমা সাধারণ মানুষ কীভাবেই বা বর্ণনা করতে পারে! শিব সকলের কল্যাণ করুন, এটাই কাম্য।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

With the Best Compliments
From :

VAIBHAV HEAVY VEHICLES LTD.

দেবভাষা বাংলা, এবার ধ্রুপদী ভাষা হোক

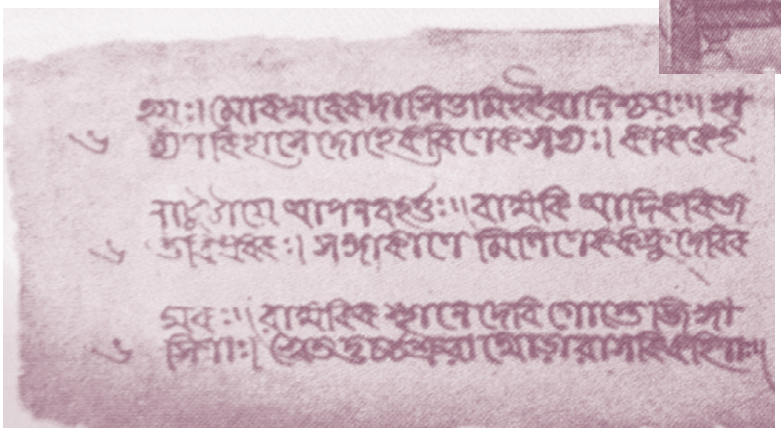

স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী

বাংলাভাষার ইতিহাস আসলে চেপে রাখার ইতিহাস। শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে সমৃদ্ধ একটা জাতিকে তার ভাষার গৌরবগাথা ভুলিয়ে দেবার প্রয়াস। এই অপচেষ্টার সূচনা হয় আজ থেকে হাজার বছর আগে, বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুড়িয়ে দেবার মধ্য দিয়ে। নালন্দা ছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়, যার অলংকার ছিলেন বাঙ্গলার ছেলে অতীশ দীপঙ্কর, আচার্য ছিলেন আরেক কৃতী বাঙ্গালি শীলভদ্র। বাংলা অক্ষরে লেখা লক্ষ লক্ষ পুঁথি সযত্নে সঞ্চিত ছিল নালন্দার গ্রন্থাগারে। সেই সব মহামূল্যবান পুঁথি কীভাবে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় হাজার হাজার বছর ধরে সংরক্ষণ করা যায়, সেই বিদ্যা প্রাচীন বাঙ্গালিদের জানা ছিল। ওই পুঁথিগুলো বেঁচে গেলে হয়তো বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে এত কষ্ট করতে হতো না। কারণ সেক্ষেত্রে পুঁথিগুলোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেই বলে দেওয়া যেত, সেগুলোর বয়স কত। আর পুঁথির বয়স যত, পুঁথিতে লেখা ভাষার বয়স অবশ্যই তত বা তার থেকেও বেশি। কারণ লেখ্য ভাষার থেকে কথ্য ভাষা আরও বেশি পুরোনো।

কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস ধ্বংসের প্রচেষ্টা সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছিল, যেদিন বিদেশি হানাদার বখতিয়ার খিলজি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা বাঙ্গলায় ঢুকেছিল। বখতিয়ার খিলজি শুধু এক আরব সাম্রাজ্যবাদীর নাম নয়, মঠ-মন্দির এবং প্রাচীন পুঁথি ধ্বংসই ছিল তার নেশা ও পেশা। বাঙ্গালিরা এই খিলজিদের চোখে ছিল শুধুই পৌত্তলিক, কাফের। কাফেরদের প্রতি সীমাহীন আক্রোশে বখতিয়ার জ্বালিয়ে দিয়েছিল নালন্দা। ৬ মাস ধরে পুড়েছিল নালন্দার বিশাল গ্রন্থাগার, তারই সঙ্গে জ্বলে ছাই হয়ে গেছিল বাংলাভাষার প্রচীনত্বের অজস্র প্রমাণ।

এরপর একে একে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় পাল রাজাদের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহ—ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা, সোমপুর, জগদ্দল ও বিক্রমপুর বৌদ্ধবিহার। প্রত্যেকটি বৌদ্ধবিহার ছিল জ্ঞানচর্চার বৃহৎ কেন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙেচুরে তছনছ করা হতে থাকে মন্দির। মন্দিরের গা থেকে খুবলে খুবলে তুলে ধ্বংস করা হয় যাবতীয় শিল্পকর্ম। বিলুপ্ত হতে থাকে বাঙ্গালির নিজস্ব দেব-দেবীর মূর্তি এবং বাংলা অক্ষরে লেখা দেব-দেবী বন্দনা। একটিও মন্দির আরব সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা পায়নি। বাঙ্গলার মাটিতে বিদেশি দখলদারদের প্রতিটি আক্রমণ ছিল ইতিহাসের গায়ে একেকটি নখের আঁচড়। এতবার ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে আমাদের ইতিহাসকে যে বাঙ্গলার মাটিতে ৫০০ বছরের বেশি পুরোনো মন্দির আর একটাও বেঁচে নেই। আমাদের পূর্বপুরুষের উপর অত্যাচারের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে বৌদ্ধ শ্রমণ ও বাঙ্গালি পুরোহিতের দল দুর্লভ পুঁথি বাঁচাতে এবং বিগ্রহ রক্ষা করতে যে যেদিকে পেরেছেন পালিয়েছেন। কেউ গেছেন তিব্বতে, কেউ নেপালে, কেউ আবার সুদূর কোঙ্কন উপকূলে। কোঙ্কনের উপকূলে যেসব বাঙ্গালি ব্রাহ্মণেরা গিয়ে উপস্থিত হলো, তাদের বংশধরেরা আজও 'গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ' নামে নিজেদের প্রাচীন পরিচয় ধরে রেখেছেন। গৌড়ীয় কথার অর্থ হলো গৌড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাঙ্গলার প্রাচীন নাম গৌড়।

এই সমস্ত কারণে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ জোগাড় করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য কাজ। টুকরো-টাকরা নানান প্রমাণ দিগবিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এসব প্রমাণ একত্রিত করার জন্য বিস্তারিত গবেষণা এবং উপযুক্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন। প্রয়োজন এই কারণেই, যে অন্তত দু' হাজার বছরের পুরনো একটা ভাষার অতীত গৌরব জোর করে কেটেছেঁটে এক হাজার বছরে নামানোর চেষ্টা চলছে। কারণ এক হাজার বছর আগেই বাঙ্গলা দখল করতে যেসব বিদেশি লুটেরারা এসেছিল, তাদের বংশজরা আজকে বাংলাভাষার দখল চায়। যদি প্রমাণ হয়ে যায় বাংলাভাষার অস্তিত্ব হাজার বছরের বেশি পুরোনো, তাহলে এটাও প্রমাণ হয়ে যাবে যে খিলজিরা আসার আগে থেকেই বাংলাভাষার অস্তিত্ব ছিল। অর্থাৎ বাংলাভাষার শিকড়ে রয়েছে বাঙ্গালি হিন্দু ঐতিহ্য। তাহলে তো বাংলা ভাষার দখল বাঙ্গালি হিন্দুর থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে না। বাঙ্গালি হিন্দুই যে আদি বাঙ্গালি, এই সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে বাংলাদেশের কষ্টকল্পিত 'হাজার বছরের বাঙ্গালি জাতি' নামের কুতত্ত্ব।

তাই সব ভুলিয়ে দিতে হবে। বাঙ্গালিকে ভুলিয়ে দিতে হবে যে তাদেরও অনেক রাজা মহারাজা ছিল। পাল রাজা ধর্মপাল, দেবপাল থেকে শুরু করে মহারাজ শশাঙ্কদের রাজভাষা

ছিল গৌড়ীয় প্রাকৃত। এই গৌড়ীয় প্রাকৃত আলাদা কোনো ভাষা নয়, বাংলাভাষারই আদি নাম। এই পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, ভাষার নাম, জাতির নাম যুগে যুগে পালটায়। তাতে ভাষাটা বা জাতিটা আলাদা হয়ে যায় না। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য ওড়িশার প্রাচীন নাম ছিল উৎকল, তারও আগের নাম ছিল কলিঙ্গ। তাই বলে কলিঙ্গ, উৎকল ও ওড়িশা আলাদা কোনো অঞ্চল নয়। যেরকম প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যই আজকের ইতালি। যতদিন রোম সাম্রাজ্য বেঁচে ছিল, ভাষাটাকে রোমান ভাষা বলা হতো। ওই একই ভাষার আধুনিক রূপকে আমরা আজ 'ইতালিয়ান ভাষা' নামে চিনি।

এই গৌড়ীয় প্রাকৃত বা প্রাচীন বাংলা ভাষাতেই লিখিত হয় বিশ্বের অন্যতম আদি সংবিধান। মহারাজ শশাঙ্কের গৌড়তন্ত্র। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। গৌড় সাম্রাজ্যে রাজার নীতি কী হবে, রাজা-প্রজা সম্পর্ক কেমন হবে, বাণিজ্য-প্রতিরক্ষা-প্রজাকল্যাণ বিষয়ে কী কী নিয়ম মেনে চলা হবে, সেই সবই ছিল গৌড়তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়। তাঁদেরই আনুকূল্যে 'গৌড়ীয় নৃত্য' পরম্পরার বিকাশ এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই নৃত্যকলার নিজস্ব উপ-শাস্ত্রটি ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, রাজ অনুগ্রহে গৌড়ীয় ভাষাতেই লিখিত হয়। শুধু তাই-ই নয়, বাঙ্গলার ছত্রিশ জাতের প্রত্যেকের যে নিজস্ব পেশাগত সঙ্ঘ ছিল, সেই সমস্ত সঙ্ঘের নিজস্ব নিয়মনীতি লেখার ভাষাও ছিল আদি বাংলা বা গৌড়ী প্রাকৃত। এই লেখার মাধ্যমেই দক্ষ পেশাদাররা বাঙ্গলার প্রতিটি শিল্পের সূক্ষ্ম কলাকৌশলগুলো ধরে রাখতেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

শুধু তাই-ই নয়, বাঙ্গলার নিজস্ব হিন্দু ধর্ম শাক্ত মতের তন্ত্রবিদ্যার পুঁথিগুলিও যে প্রাচীন বাংলাতেই লেখা হয়েছিল, তার অনেক পরোক্ষ প্রমাণ আছে। এই তন্ত্রসাধনাতেই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন বাঙ্গলার বিখ্যাত তান্ত্রিক নিগূঢ়া, তিলোপা, নারোপারা। আজকের বাঙ্গালি এদের ভুলে গেলেও এদের দিব্যি মনে রেখেছে তিব্বতের মানুষজন। তারও আগে, অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সহজ-সরল কথ্য ভাষায় বাঙ্গালির নিজস্ব জীবন-নীতি লিখেছিলেন খনা। যাঁর বাসস্থান ছিল প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে। 'খনার বচন' নামে তার সেই অতুল কীর্তি আজও গ্রাম্য বাঙ্গালির মুখে মুখে ফেরে। গ্রামবাঙ্গলার মানুষ যেসব লৌকিক দেব-দেবীর পুজো করেন, তাঁদের স্তব-স্তুতিতে লেখা মঙ্গলকাব্যগুলিও বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ। এখনো বাংলায় ব্রতপাঠ আমাদের ঠাকুরঘর থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি। কান পাতলেই শোনা যায়, বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীব্রত, সন্তানের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীব্রত বা ওলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালি। আধুনিক কালে ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা গীতির ভাষাও বাংলা।

বাংলাভাষার প্রচার ও প্রসারে বৈষ্ণবরাও কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। মতুয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রায় সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থই বাংলাভাষায় লেখা। প্রার্থনা সংগীত ও বীজ মন্ত্রও বাংলাতে। তাই গত কয়েকশো বছর ধরে বাঙ্গালি বৈষ্ণবরা ধর্মপ্রচারে যে যে রাজ্যে গেছেন, সর্বত্রই বাংলাভাষা তাঁদের সঙ্গী হয়েছে। সুদূর মণিপুরে গিয়ে বাংলাভাষার মাহাত্ম্য প্রচার করে বাংলাভাষাকে রাজভাষা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে রাজধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী শান্তিদেব গোঁসাই। তাঁর এই একক প্রচেষ্টা ভক্তদের মধ্যে বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের নিরলস চেষ্টায় ইউরোপ থেকে আমেরিকা এবং এশিয়া থেকে আফ্রিকা সর্বত্রই বাংলাভাষায় হরিনামের প্রচলন হয়। এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মূল গ্রন্থগুলো বাংলায় পড়বার জন্য বিদেশি ভক্তদের মধ্যে বাংলা শিক্ষার আগ্রহ বাড়ে।

ভাষার প্রথম সৃষ্টি হয় ভাবের আদান-প্রদানের জন্য। মানুষের মধ্যে ভাবের প্রকাশ যত বেড়েছে, ভাষা চর্চার সুযোগও তত বেড়েছে। যে কোনো উন্নত ভাষা অন্তত চারটি কাজে ব্যবহৃত হয়— জ্ঞানচর্চা, ধর্মচর্চা, সংস্কৃতি চর্চা ও রাজকার্যে। বাঙ্গালি হিসেবে এটা আমাদের গর্বের বিষয় হওয়া উচিত যে বাংলাভাষা বিশ্বের সেসব হাতে গোনা ভাষাগুলোর মধ্যে একটি, যার প্রয়োগ এই চারটি কাজেই হয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রয়োগ নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। সাহিত্য, সংগীত, কাব্য প্রতিভায় বাঙ্গলার উৎকর্ষ সকলেরই জানা। তবে ঐতিহাসিক কাল থেকে রাজভাষা হবার সৌভাগ্য সব ভাষার হয় না। দেবভাষা হবার কৃতিত্ব থাকে হাতেগোনা কয়েকটি ভাষার। যে ভাষায় ধর্মচর্চা হয়, মূল ধর্মগ্রন্থ লিখিত হয়, তাকেই বলে দেবভাষা। বাইবেল অনেকগুলো ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ হলেও মূল বাইবেল হিব্রু ভাষায় লিখিত। যিশুখ্রিস্টের মাতৃভাষা ছিল আরামাইক। কোরান শরিফ লেখা এবং পাঠ করা হয় আরবি ভাষায়। কিন্তু মতুয়া, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, তান্ত্রিক এবং শাক্ত হিন্দুদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাভাষা এই বিরল গৌরবের অধিকারী হয়েছে। কারণ এই সমস্ত ধর্মমতগুলিতে প্রাচীনকাল হয়ে এখনও পর্যন্ত প্রার্থনা সংগীত থেকে ধর্মতত্ত্ব বাংলাভাষাতেই চর্চা হয়ে চলেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এত উন্নত একটা প্রাচীন ভাষা কি খিলজিদের দৌরাত্ম্যেই শেষ হয়ে যাবে? তার প্রাচীনত্বের, মহান ঐতিহ্যের কোনো স্বীকৃতিই কি ভারত সরকারের থেকে পাবে না? কারণ ভারতে প্রচলিত 'ধ্রুপদী ভাষা নীতি' অনুযায়ী ভাষার প্রাচীনত্বই ধ্রুপদী ভাষা হবার মূল প্রমাণ। বাংলাভাষার বয়স ১৫০০ বছর, এটুকু সন্দেহাতীত ভাবে দেখানো গেলেই, আসবে স্বীকৃতি। আর স্বীকৃতি এলে আসবে বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে ১০০ কোটি টাকার এককালীন অনুদান। সঙ্গে প্রতি বছর আরও ৫ কোটি টাকার অনুদান। প্রতিটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা। শুধু তাইই নয়, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, ভারতের ছাত্র-ছাত্রীরা যেন মাতৃভাষা এবং ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে একটি ধ্রুপদী ভাষা শেখেন। অর্থাৎ বাংলাভাষা ধ্রুপদী স্বীকৃতি পেলে সেটা সারা ভারতের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বাংলা ভাষাশিক্ষার একটা বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হবে। যার ফলে বাংলাভাষা নিয়ে যারা ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তাদের কর্মসংস্থানেরও একটা সুযোগ আসবে। আমাদের ভাষাটাকে অবৈধ দখলদারদের থেকে বাঁচাতে, বাঙ্গালির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, আমাদের তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের স্বার্থে বাংলা ভাষার বয়স ১৫০০ বছর প্রমাণ করাটা অত্যন্ত জরুরি। এটা আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতার লড়াই।

মিথ্যাচারের শক্তি আছে। মিথ্যাচার দিয়ে অনেক কিছু সম্ভব। মিথ্যা তত্ত্ব বানিয়ে কিছু মানুষকে কিছুদিন বোকা বানানো যায়। কিন্তু প্রচার যতই বেশি হোক, তা দিয়ে সব মানুষকে চিরদিন বিভ্রান্ত করা যায় না। কারণ সত্যিটা ঠিক ফাঁকফোঁকর দিয়ে যথা সময়ে মাথা বের করবেই। বাংলা ও বাঙ্গালির চেপে রাখা ইতিহাসের উপর আলো পড়তে শুরু করেছে। জাতিটার চোখ ধীরে ধীরে খুলছে। এখনই সময় আমাদের প্রাপ্য বুঝে নেবার। নিঃসঙ্কোচে নিজেদের কথা নিজ মুখে বলবার। জোর গলায় দাবি জানাবার, দেবভাষা বাংলা এবার ধ্রুপদী ভাষা হোক।

(লেখক মুম্বই প্রবাসী আইনজীবী)

বিচার ব্যবস্থা কলঙ্কিত

কাটজুর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিক কেন্দ্র

নিজে একজন বিচারপতি হয়ে কাটজু যেভাবে দেশ, দেশের বিচারব্যবস্থা, দেশের আইনমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে কলঙ্কিত করেছেন, অপমানিত করেছেন, তাতে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে দেশজুড়ে।

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা, পরপর সর্বভারতীয় নেতাদের রাজ্যে আগমন, সভা, রথযাত্রার ক্রমিক তোড়ে ঢাকা পড়ে রইল যে খবর তার গুরুত্বের কাছে এই খবরগুলি পানসে। কিন্তু খবর পরিবেশনা যেহেতু কেন্দ্রীয় শাসকদলের প্রতি একটি জন্মগত ঘৃণার লালন এবং তা বাবদ অর্থ উপার্জনের পন্থা মাত্র, তাই নীরব মোদীর ভারতে প্রত্যাগমনের খবর স্থানীয় মুদ্রিত ও বৈদুতিন উভয় মাধ্যমেই প্রায় বাঁ হাতে মনসা পুজোর মতো আলগোছে পরিবেশন করা হলো। অথচ দীর্ঘদিন ধরেই বিচিত্র চরিত্রের বিরোধী নেতাদের বিশেষ করে কংগ্রেস নেতাদের

মার্কণ্ডেয় কাটজু

নীরব মোদী

পক্ষ থেকে বড়া মোদী, ছোটা মোদী বলে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই অর্থনৈতিক জালিয়াতের বিকৃত তুলনা টানায় কোনো ত্রুটি ছিল না।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের ক্রাউন্স কোর্ট ভারতের পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে যিনি ৬ হাজার ৪৯৮ কোটি টাকা তছরূপ করে পলাতক আসামি হয়ে যান, সেই নীরব মোদীকে ভারতের হাতে প্রত্যার্পণের আদেশ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধী ধরা কষ্টসাধ্য কাজ। অনেকের মনে পড়বে ৭০ এর দশকে এক ভারতীয় ও থাইবংশজাত চকমকে অপরাধী চার্লস শোভরাজ বিশ্বের নানা প্রান্তে ১২ জন মহিলাকে খুন করেছিলেন। মৃত্যুর সময় মহিলারা অধিকাংশই স্বল্পবাস পরিহিত হওয়ায় শোভরাজকে 'বিকিনি কিলার' বলা হতো। রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া এই খুনিকে ধরতে ভারতীয় পুলিশের কালঘাম ছুটে গিয়েছিল।

স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক জালিয়াতি করে দেশত্যাগী অপরাধীকে এই প্রথম সফলভাবে দেশে ফেরানোর নির্দেশ এসেছে। কোর্টের চাঞ্চল্যকর বয়ান ও এই অপরাধীকে ধরার পেছনে ভারতীয় আধিকারিকদের নিরলস চেষ্টা ও সরকারের প্রধানের লাগাতার মদত দেওয়া ও

আদালতে ভারতকে কলঙ্কিত করা অপরাধী পক্ষের এক সাক্ষীর ন্যাক্কারজনক ভূমিকা নেপথ্যেই থেকে গেছে।

Sams Goozee নামের ওয়েস্ট মিনিস্টার আদালতের বিলিতি জজ এই বেলজিয়াম ও ভারতের দ্বৈত নাগরিককে অপরাধী সাব্যস্ত করে বলেছেন, এতে আসামির দাবি মতো মানবাধিকার লঙ্ঘন বা তাঁর প্রতি অবিচার কোনোটাই হবে না।

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেলের কাছে রীতিমাফিক কেবলমাত্র প্রত্যার্পণপত্র সই করার জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁকে দু মাসের মধ্যে এই নথিতে সই করতে হবে। এই সময়সীমার মধ্যে এই জজের কাছেই কেন তাকে ব্রিটেনে রাখা হবে না এ নিয়ে আবেদন করতে পারেন নীরব মোদী। কিন্তু জজ যদি এতে সারবত্তা না পান যা বিজয় মাল্যর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারক পাননি এবং আবেদন নাকচ করে তাঁকে ভারতে ফেরার আদেশ দিয়েছেন (অন্য একটি আইনি কচকচিতে তা আটকে আছে। মনে রাখবেন ব্রিটিশজাত ঘুষটা খুব ভালো চেনে। সিরাজদ্দৌল্লা থেকে উমিচাঁদ সেই তালিকা দীর্ঘ), সেক্ষেত্রে ১৪ দিনের মধ্যে নীরব মোদীজীকে উড়োজাহাজ ধরতে হবে।

ভারতে কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের অন্যতম কর্তা অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, ভারত সরকার 'would liaise with UK authorities for his early extradition to India.' কিন্তু বিষয়টা এত সহজে হয়নি। দীর্ঘ করোনা পর্বে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় আধিকারিকরা প্রয়োজনীয় নথি তথ্য নিয়ে নিয়ম করে লন্ডনে উড়ে গেছেন, আদালতে সাক্ষী দিয়েছেন। এর মধ্যে কূটবুদ্ধি জালিয়াতটি উকিল মারফত আদালতে তাঁর ক্রমিক পাগল হয়ে যাওয়ার তথ্য খাড়া করার চেষ্টা করেন। তিনি মনোবিদ অ্যান্ড্রু ফরেস্টারকে নাকি বলেন তিনি সবসময় ব্লেড খোঁজেন। বলেন, 'it is better to commit suicide rather than be killed'। ভারতে এলেই নাকি তাঁকে মেরে ফেলা হবে। বিচারক এই ছলনাকে পাত্তা দেননি। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতির ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে। আর মোদীর মানসিক অবস্থা এমন নয় যে তিনি আত্মহত্যার চিন্তা এলে তাকে প্রতিহত করতে পারবেন না। ভারত সরকার এ মর্মে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চয় নেবে। এরপর বিচারক তাঁর আর একটি ফন্দিও নাকচ করেন। মিচেল নামের এক ডাক্তারবাবু বলেন, ভারতের জেলের পরিকাঠামো নীরব মোদীর মতো সর্বত্যাগী মানুষের উপযুক্ত নয়। বিচারক বলেন, ডাক্তারবাবু তো জেল দেখে আসেননি। আমরা জালিয়াতের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাক নং ১২-র ভিডিয়ো ছবি দেখেছি। জায়গাটা এখানকার থেকে ভালো। উঁচু সিলিং, টিভি, পাখা, সংলগ্ন মলঘর যা একজন নিম্নমানের অপরাধীকে লালন করার পক্ষে যথেষ্ট। ধরাশায়ী হয়ে পড়েন মাইনে করা জালিয়াত পক্ষের উকিল। কিন্তু নীরবের এই সব বিলিতি উকিলের বাইরেও দুটি ভাড়া করা কুলাঙ্গার সাথী ছিল। তাঁরা অর্থনৈতিক বিষয়ের তুল্যমূল্য বিচার অবশ্যই করতে পারতেন কিন্তু তাঁরা টাকার বিনিময়ে ঘৃণ্য রাস্তা ধরেন।

এই মামলায় যাঁদের নামও ইতিহাসে থেকে যাবে এঁদের একজন মার্কন্ডেয় কাটজু। ইনিও দেশবিরোধী বক্তব্যের জন্য সুপরিচিত। তিনি ও সহযোগী উকিল থিপসে বলেন, 'ভারতের আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর সাম্প্রতিক এই মামলা সম্পর্কে কংগ্রেস দলকে গালাগালি দিয়েছেন। যা মামলাকে প্রভাবিত করবে।' জজ সব শোনেন। এরপর তিনি কুলাঙ্গার কাটজুর কাহিনিও শোনেন। কাটজু আদালতকে জানান তিনি ভারতের আইন ব্যবস্থার একজন ভেতরের লোক। ২০ বছর সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। তিনি জানেন ভারতের আইনব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত ও শাসকদলের কুক্ষিগত। দেশের ৫০ শতাংশ জজ ও উকিল ঘুষখোর। তারা সরকারের চাকর। কেন্দ্র নিজের সুবিধে অনুযায়ী লোককে মকদ্দমায় ফাঁসায়। তাই মোদী ওখানে সুবিচার কখনই পাবেন না। তিনি আরও জানান অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্যর্থ। তিনি এখন হিটলারের ভূমিকায় আর এই নীরব মোদী মোটেই অপরাধী নয় (মোট জালিয়াতি ১৪০০০ হাজার কোটি)। সে একজন হতভাগ্য জ্যু অর্থাৎ ইহুদির সমতুল। জজ এই সমস্ত কথায় হতবাক হয়ে যান। দীর্ঘদিন দেশের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি থেকে কোনো ব্যক্তি তাঁর দেশ ও সরকারকে এমন কদর্যভাবে বিদেশের আদালতে আক্রমণ করতে পারেন এটি তিনিও হজম করতে পারেননি। তিনি তাঁর রায়ে লিখেছেন কাটজু তাঁর ব্যক্তিগত অভিসন্ধি মেটাতে এসেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'insensitive, inappropriate and incoherent hence unacecptable'। তিনি সবকিছু নাকচ করে দেন।

ভাবুন, এই কাটজুর দাদু স্যার কৈলাশনাথ কাটজু ছিলেন একজন জেলখাটা স্বাধীনতা সংগ্রামী। হয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। কাকা বিএন কাটজু ছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি! নিজে ২০ বছর মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি। দেশ যাদের এত দিল, তারা দেশকে ফিরিয়ে দিল শুধুই আর্বজনা। ভারত সরকার যেমন নীরব মোদীর জন্য জান লড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি এই কলঙ্কময় দেশদ্রোহীটিকেও না ছেড়ে পত্রপাঠ তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত মামলা করে দেশের গোটা আইন ব্যবস্থাকে অপমান করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক। মোদী তো ফিরছেই দেশের সেই গৌরব যেন ম্লান না হয়।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক)

With Best Compliments from-

A
Well
Wisher

খুঁজে পাচ্ছি না সুনীলের বিকল্প

কল্যাণ চৌবে

৩৬ বছরেও তিনি চিরতরুণ। গোল করার খিদে, সেই একই রকম। নিষ্ঠা, একাগ্রতা যেন তাঁর অভিধানে জ্বলজ্বল করে এখনও।

কোভিডের মধ্যে বহু ভারতীয় ফুটবলার প্র্যাক্টিসের সুযোগ পাননি। কিন্তু সুনীল ছেত্রীর যেন বিকল্প নেই। চলতি আইএসএলে সেই একই ছবি। যাবতীয় গোল বিদেশিদের। প্রত্যেক টিমের ১৬টি করে ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিদেশিদের ভিড়ে একজন ভারতীয় ফুটবলারের উজ্জ্বল উপস্থিতি। তিনি সুনীল। শুধু বয়স নয়, পাল্লা দিচ্ছেন সময়ের সঙ্গেও। বয়স যে একটা সংখ্যা মাত্র, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন সুনীল।

১৬ ম্যাচে সুনীলের নামের পাশে পাঁচ গোল। হিসেবের অঙ্কে অত্যন্ত কম। কিন্তু বিদেশি স্ট্রাইকারদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন সুনীল। এটিকে মোহনবাগানের রয় কৃষ্ণার ১২ গোলের পাশে নিতান্ত নগণ্য সুনীলের পাঁচ গোল। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের পরিস্থিতি বিচার করে সংখ্যাটা একেবারে ফেলে দেওয়ার নয়।

এসসি ইস্টবেঙ্গলের ভারতীয় ফুটবলারদের পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনা করার জন্য ঝড় উঠেছিল। খোদ লিভারপুলের কিংবদন্তি ফুটালার ভারতীয় ফুটবলারদের সমালোচনা করেছিলেন, যা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। সেই বিতর্কে না গিয়ে বলতে পারি, সাত নম্বর আইএসএল চলছে। কোথায় নবীন প্রজন্ম? মোহনবাগানের মনবীর সিংহের দুটো গোল দেখেছিলাম। মনবীরের মধ্যে সম্ভাবনার ছবি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাকিরা? একটা টিমে পাঁচজনের বেশি বিদেশি খেলতে পারে না। বাকি ছয়জন তো স্বদেশি।

পাশাপাশি এও সত্য, গোল করার জন্য টিমের কোচরা বিদেশি স্ট্রাইকারদের পছন্দ করে। ভারতীয় ফুটবলারদের উপর ভরসা করেন না। যদি করতেন আমাদের স্ট্রাইকারা দিনের আলো দেখতে পারত। যেমন মনবীরকে নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখা শুরু করেছি। কিন্তু একটা মনবীর, একটা হোলিচরণ নার্জারি দিয়ে কী হবে? কোনওদিনই সম্ভব নয়। ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে ভারতীয় ফুটবল টিম খেলেছিল। ভারত ছিল আয়োজক। আমরা আশা করেছিলাম, একটা দারুণ স্কোয়াড ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হবে। জাতীয় টিমে সোনা ফলবে! নিরাশাই সার। একজন বা দু'জন ছাড়া বাকিরা কেউই সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি।

চলতি আইএসএলে ১৬ ম্যাচের পরে গোলের তালিকায় চার স্বদেশি নাম ভেসে উঠেছে। সুনীল, মনবীর, হোলিচরণ ছাড়া চার নম্বরে গোয়ার ইশান পণ্ডিতা। এখনও পর্যন্ত তিন গোল করেছে। যদিও এখনও ম্যাচ বাকি রয়েছে। আরও কিছু গোল ভারতীয় ফুটবলরদের দেখতে পাব। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ভারতীয় ফুটবলারদের গোলের সংখ্যাটা খুব বেশি একটা বাড়বে না।

যদিও গোলের সংখ্যা দিয়ে ভারতীয় ফুটবলারদের আইএসএলে বিচার করা ঠিক হবে না। রক্ষণে বেশ কিছু ভারতীয় ফুটবলারের খেলা ভালো লেগেছে। শেষলগ্নে টিমে যোগ দিয়ে এসসি ইস্টবেঙ্গলে ডিফেন্ডার রাজু গায়কোয়াড দারুণ খেলছে। ভালো নম্বর দেওয়া যায় মোহনবাগানে সন্দেশ জিঙ্খানকেও।

দেবজিৎ মজুমদাদের গোলকিপিং বেশ ভালো লেগেছে। যে কটি গোল খেয়েছে, অধিকাংশের জন্য দেবজিৎকে দায়ী করা চলে না। আইএসএলের পরিসংখ্যান বলছে, দেবজিৎ খেয়েছে ২০ গোল। গোল খাওয়া দিয়ে আমি অবশ্য গোলকিপার মান যাচাইয়ে পক্ষপাতী নই। বরং আমি গোলকিপারের লিডারশিপ কোয়ালিটি যাচাই করার চেষ্টা করি। ভঙ্গুর রক্ষণ নিয়ে গোলকিপারের পক্ষে সম্ভব নয়, গোল বাঁচানো অথবা ম্যাচ বাঁচানো। শীর্ষে থাকা মুম্বইয়ের গোলকিপার অমরিন্দর সিংহ নিজেও ৪৪টি সেভ করেছে। দারুণ রক্ষণ নিয়েও। এই সামান্য কিছু প্রাপ্তিতে ভারতীয় ফুটবল কী আদৌ উপকৃত হচ্ছে? উত্তরটা ভবিষ্যতের গর্ভেই রয়ে যাচ্ছে।

(লেখক জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন ফুটবলার এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী)

সবার দাতা ভগবান

মোগল আমলের কথা। বাদশা আকবর একদিন সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে শিকার করতে গিয়েছেন। দৈবক্রমে তিনি জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললেন। ঘুরতে ঘুতে বন শেষ হয়ে গেল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি কাতর। সামনে দেখেলেন এক কৃষকর বাড়ি। বাড়ির ভিতরে গিয়ে কৃষককে বললন, আমি রাজ্যের একজন কর্মচারী। আমার খুব খিদে পেয়েছে। কৃষক কিছু খাবার ও ঠাণ্ডা জল দিলেন। বাদশা খেয়ে তৃপ্ত হলেন। তারপর অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে যাবার সময় বললেন, আমার নাম আকবর। তোমার যদি কোনোদিন কোনো দরকার পড়ে তবে দিল্লি এস। কৃষককে এক টুকরো কাপড়ের ছাঁট আনতে বললেন। তারপর সেই কাপড়ের উপর তিনি সিলমোহর লাগিয়ে বললেন যেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে সেদিন এটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কৃষক কাপড়ের ছাঁটটি ভাঙা তোরঙ্গের এক কোণে রেখে দিল।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। কৃষক কাপড়ের টুকরোটির কথা ভুলে গেছে। একবার দেশে আকাল পড়ল। বর্ষা হলো না। ফসল ফলল না। কৃষক খুব কষ্টে পড়ল। নিজেদের খাবার জুটছে না, তার ওপর গোরু-মোষগুলির জন্য ঘাস-খড় জোটানোও মুশকিল হলো। পানীয় জলেরও অভাব দেখা দিল। তখন কৃষকের স্ত্রী বলল একদিন তো রাজার লোক আমাদের ঘরে এসেছিল। বলেছিল দরকার মতো দিল্লিতে গিয়ে দেখা করতে। একবার তার কাছে যাও না! স্ত্রীর কথায় কৃষক সেই কাপড়ের ছাঁটটি সঙ্গে নিয়ে দিল্লি রওনা দিল। দিল্লি পৌঁছে সকলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল আকবরের বাড়ি কোনটা? আকবরের নাম শুনে একজন বাদশার প্রাসাদটি দেখিয়ে দিল। কৃষক রাজপ্রসাদের ফটকের কাছে গেলে প্রহরীরা ধমক দিল। কৃষক তখন সিলমোহর দেওয়া কাপড়ের ছাঁটটি দেখালো। প্রহরীরা চমক উঠল শাহি সিলমোহর দেখে। বাদশা নিজ হাতে এই সিলমোহর দিয়েছেন। তারা কৃষককে বাদশাহের কাছে নিয়ে গেল। বাদশা উঁচু সিংহাসনে বসেছিলেন। তাকে দেখে কৃষক বলল, ও আকবর, তুমি তো অনেক উঁচুতে বসে আছ। বাদশা বললেন, এস ভাই, বসো। তারপর সিংহাসন থেকে নেমে বললেন, একটু অপেক্ষা কর ভাই, আমার নামাজ পড়ার সময় হয়েছে। নামাজ পড়ে নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব। কৃষক দেখল আকবর একটা কাপড় বিছিয়ে তার ওপর বসছে আর উঠছে। আকবরের নামাজ পড়া শেষ হলে কৃষক জিজ্ঞসা করল, এ তুমি কী করছিলে? বাদশা জবাব দিলেন, আমি পরমেশ্বরর কাছে প্রার্থনা করছিলাম। কৃষক বলল আমি তো বুঝতে পারলাম না। আকবর বললেন, আমাদের ওপরে ভগবান আছেন, এ হচ্ছে তাঁর সামনে ধরনা দেওয়া। দিনে কতবার এরকম করতে হয়— কৃষক বলল।

আকবর বললেন, দিনে পাঁচবার করতে হয়। যে মালিক দুনিয়ার সবকিছু দিয়ে রেখেছেন তাঁর কাছে দয়া ভিক্ষা করতে হয়। কৃষক বলল, 'আমি তো একবারও প্রার্থনা করি না, তা সত্ত্বেও তিনি সবকিছু দিয়ে রেখেছেন, আর দিচ্ছেন। আর তোমাকে পাঁচবার প্রার্থনা করতে হয়? তাহলে আমি চললাম ভাই' বলে সে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। বাদশা বললেন, কী জন্য এসেছিলে বললে না তো? কৃষক বলল, দেশে বড়ো আকাল, খুব কষ্টে পড়েছি। তাই বউ তোমার কাছে আসতে বললে। তুমিও বলেছিলে। এখন দেখলাম তুমি নিজেই ভিখিরি। টাকাপয়সার জন্য দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ছ। তাহলে তোমার কাছে আর কী চাইব?

বাড়ি ফিরে এলে কৃষকের স্ত্রী বলল, কী হলো। কৃষক বলল বাদশা নিজেই ভিখিরি। ভগবানের কাছে দিনে পাঁচবার ভিক্ষে চায়। আমি ভগবানের কাছে কিছুই চাইব। ভগবান বাড়িতে দিয়ে গেলেই নেব। এর কদিন পরে কয়েকটা চোর চুরি করার মতলবে কৃষকের গোয়ালে লুকিয়ে ছিল। সে রাতে কৃষক আর তার বউতে কথাবার্তা চলছিল। কৃষক বলছিল আমি কারো থেকে কিছু চাই না, ভগবানের কাছেও চাই না। ভগবান যদি নিজে বাড়িতে দিয়ে যান তাহলেই নেব। আজকর কথাই বলি। নদীর ধারে সকালে গিয়ে দেখি একটা ধস নেমে গেল। দেখি মাটিতে একটা হাঁড়ি পোঁতা রয়েছে। খুলে দেখি সোনাদানা, মোহর কত কী ভরা রয়েছে। ওটা তো আমার নয়, তাই নিলাম না।

চোরগুলো কৃষকের সবকথা শুনে ওই রাতেই নদীর ধারে গিয়ে সত্যিই একটা হাঁড়ি দেখতে পেল। কাছে যেতই হাঁড়ির ভিতর থেকে একটা সাপ ফোঁস করে উঠল। চোরেরা ভাবল কৃষক নিশ্চয় আমাদের দেখেছে। আমাদের মারার জন্য এসব কথা বানিয়ে বলেছে। তারা বলল চলো তো হাঁড়িটা কৃষকের ঘরেই ফেলে দিয়ে আসি। তারা হাঁড়ির মুখ ভালো করে বেঁধে কৃষকের বাড়ি এসে ঘরের চাল ফুটো করে হাঁড়িটা উলটে ঢেলে দিল। সোনার মোহরে চাপা পড়ে সাপটা মরে গেল। সকালে কৃষক আর স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে দেখল সোনা আর মোহরে তাদের ঘর ভর্তি। কৃষক তার স্ত্রীকে বলল দেখ, ভগবান যাকে দেন তার ছাদ ফুটো করেই দেন। তাই ভগবানর কাছেও চাইতে নেই। তিনি সব জানেন কার কী দরকার।

শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের পথে পথে

নাহান

৯৩২ মিটার উচ্চতায় শিবালিক পর্বতের এক পাহাড়ি শিরায় পাহাড়ি শহর নাহান। চারপাশের প্রাকৃতিক শোভা খুব সুন্দর। লেক, মন্দির ও বাগিচা নিয়ে শহর। রাজা করুণা প্রকাশ ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে এই শহরের পত্তন করেন। দেশীয় রাজ্য শিরমুরের রাজধানী ছিল নাহান। সার্কিট হাউসে আজও তার নিদর্শন রয়েছে। বর্ষা শেষ হলেই বাওয়ান দ্বাদশীর উৎসব হয়। শোভাযাত্রা করে বাহান্ন দেবতার বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় জগন্নাথ মন্দিরে। এই সময় দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ভিড় করেন। শহরের মধ্যস্থলে রানিতালের মন্দিরটিও খুব সুন্দর। ১৬৮৫ খিস্টাব্দে এখানে গুরু গোবিন্দ সিংহ আসেন। দুটি গুরুদ্বারা রয়েছে। দুর্গের পাদদেশে খেলার মাঠকে ঘিরে শহরের ঘনবসতি। নাহানের ৬৩ কিলোমিটার দূরে ত্রিলোকপুরে রয়েছে বালাসুন্দরী মন্দির।

জানো কি?

কোন পত্রিকা কে সম্পাদনা করতেন

- বেঙ্গল গেজেট– অগাস্ট হিকি।
- অমৃতবাজার পত্রিকা– সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- তলোয়ার– বিনায়াক দামোদর সাভারকর।
- সুলভ সমাচার– কেশবচন্দ্র সেন।
- সংবাদ প্রভাকর– ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। (বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা)।
- সংবাদ কৌমুদী– রাজা রামমোহন রায়।
- বঙ্গদর্শন– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ভারতী– দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- সবুজপত্র– প্রমথ চৌধুরী।

ভালো কথা

লকডাউনের সুফল

লকডাউন শুরু হওয়ার একমাস পরে গাছপালা সব সবুজ হয়ে গেছিল। আকাশটাও আরও নীল লাগছিল। গঙ্গার জল আয়নার মতো স্বচ্ছ দেখাচ্ছিল। গঙ্গায় কোনো নোংরা ভেসে আসছিল না। পবিবেশ যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। আসলে লকডাউনের সময় মানুষ ঘর থেকে কম বের হয়েছে। গাড়ি একেবারেই চলেনি। তাই দূষণ ছিল না। ঠাকুমার হাঁপানি আছে। ঠাকুমা বলছিল, তখন তাঁর হাঁপটাও কম হয়েছিল। ঠাকুমার ইচ্ছা, সারা পৃথিবাতে সপ্তাহে একদিন পূর্ণ লকডাউন হোক। তাহলে পৃথিবীর আয়ু বেড়ে যাবে।

রামকৃষ্ণ দাস, একাদশ শ্রেণী, ফরাক্কা, ব্যারেজ কলোনি। মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) কু ঘৃ মা ত	(১) দা ং ম শ র্যা
(২) রা ছে ছো ক	(২) সি মা ব ঝ য়

২২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) জীবনধারা (২) নবজাগ্রত

২২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) সন্ধ্যামালতী (২) সন্ধ্যাবন্দনা

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯। (২) সায়ন দেব, হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর। (৩) প্রিয়া মজুমদার, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ। (৪) আকাশ সরদার, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ৪।।

মাধবের দাদা অমৃত হঠাৎ মারা গেলেন। ছেলের শোকে মা ভেঙে পড়লেন।

এগারো বছর বয়সেই মাধব জানত কীভাবে মায়ের মনের ভার কমানো যায়

ইংরিজি ক্লাসে একদিন শিক্ষক লক্ষ্য করলেন—

মাধবরাও! ওঠো। এতক্ষণ কী পড়ালাম বলো—

মাধব ঘুম ভেঙে উঠেই, বই না খুলে গড়গড় করে সব বলতে শুরু করল।

মাধবের স্মরণশক্তির পরিচয় পেয়ে সবাই অবাক হয়ে যায়।

মাধবরাও হিসলপ কলেজে ভর্তি হলেন। কলেজে বাইবেল পাঠ বাধ্যতামূলক। অধ্যাপক গার্ডিনার পুরনো বাইবেল শিক্ষক। একদিন তিনি ভুল উদ্ধৃতি দিলেন—

বামপন্থী কবির সেকুলারি টুইস্ট এবং লিকার চা

কল্যাণ গৌতম

বঙ্গদেশে একটু-আধটু কবিতা লেখা জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য। যারা প্রবল কাব্য-বিরোধী তারাও আদতে কবি। পঞ্চাশ বছরের কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কবিতা মূলত ত্রিবিধ— প্রেমের কবিতা, সেকুলারি কবিতা আর প্রকৃতি প্রেমের কবিতা। ইদানীং দেশপ্রেমের কবিতা বাংলা কাব্যচর্চায় এক বিশেষ আঙ্গিক। এর বিস্তার অপ্রতিরোধ্য, সোশ্যাল মিডিয়া এর অতুল্য দুনিয়া। এক দশক আগেও বাঙ্গলার বুদ্ধিজীবী ছিল দ্বিবিধ— কবি ও সেকুলার কবি।

সেকুলারি কবিতা আবার কী? সেকুলার কবিরা কাব্যে ছোটোগল্পের মতো বিশেষ বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল, তাকে বলা যায় 'সেকুলারি টুইস্ট'। 'ধর্মনিরপেক্ষ-মোচড়'। অনেকটা 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতার মফস্‌সলি-সংস্করণ। বিগত কয়েক দশক জুড়ে বাঙ্গলার শহরে নগরোপান্তে, মফস্বলে, শহরে এবং অতি অবশ্যই মহানগরীতে যে বনফুলের মতো পত্রিকা জন্মাতো আর আপনিই মরে যেত তার সিংহভাগ জুড়েই ছিল 'সেকুলারি কবিতা'। তার শব্দচয়ন দেখলেই বুঝে যাবেন। নিজের ধর্মকে খাটো করা, অন্য ধর্মকে, তাদের সংস্কৃতিকে মহান করে দেখানো, মধ্যে মধ্যে বস্তুবাদী রসদের জোগান--- তারপর থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড় এবং কপি-পোস্তের তরকারি। ব্যাস, সেকুলারি কবিতা কমপ্লিট।

কারা পড়েন এই কবিতা? কবি নিজে, পত্রিকার বস্তুবাদী-সম্পাদক (কবিতার প্রুফ দেখার সময়) এবং জুলুমি-পাঠক (কবিতা পড়ার জন্যে কবি কর্তৃক পত্রিকাটি জোরজুলুম করে বেচা গো-বেচারি হিন্দু বাঙ্গালিটি)। আজকাল সেই পাঠক পাড়ার মোড়ে দাপিয়ে বেড়ানো রাজনৈতিক-কবিদের থেকে খানিক রেহাই পেয়েছেন। বাব্বা! সে কী বাঁচা! তো, বারাকপুর শিল্পাঞ্চল বরাবরই সেকুলার কবি-সাহিত্যিকদের আবাসস্থল বলে খ্যাত। জলবায়ুও উত্তম। মানে জমা-জল, অপ্রবাহিত নর্দমায় উৎপাদিত মশা, দংশনের পূর্বে তার পক্ষান্দোলনের সুবাতাস--- কবিকুলকে কবিতা রচনায় যথেষ্ট উৎসাহিত করত। প্রাক্তন খড়দাবাসী হয়ে আমারও কিছু কবিতা হয়ে উঠত। কিন্তু আমার সম্পাদক জুটতো না, কারণ কাব্যে যথেষ্ট 'সেকুলারি পাঁচফোড়নে'র অভাব ছিল। ফলে তা আর কবিতা হয়ে উঠতো না। ফলে তা 'বিকোতো'-ও না। কবিতার খাতার পাতা অবশেষে পুরাতন খবরের কাগজের সঙ্গে ফেরিওয়ালার কাছে চলে যেত।

একবার আমার এক বাল্যবন্ধু সহসা চানাচুরের ঠোঙায় আমার এক কবিতা আবিষ্কার করে আমায় ফেরত দিয়ে গেল। ওটাই আমার কলেজ জীবনে লেখা একমাত্র বেঁচেবর্তে থাকা পাণ্ডুলিপি। কী ছিল সেখানে? 'কথার অতলে আর কথা/মানুষের কথা বুঝে ওঠা দায়,/মানুষের মনের কথা।/ মানুষের মনের কথা শুধু নরকের কীট থেকে ধার করে আনা।..."। বাব্বা! এখন ভাবি কী সাংঘাতিক কথা! বাম-যাপনের মানুষগুলোকে নিয়ে নয়ের দশকে কী হতাশাই না ছিল। আসলে হতাশা ছিল কবিদের আচরণে। ওই কবিরা একটি কবিতাও কবিতা-পাঠের আসরে পড়তে ডাকেনি, লিখতেও বলেনি। কারণ ওতে বামপন্থার বারুদ ছিল না। না ছিল ভিয়েতনামি ভাত, না ছিল হাভানা-চুরুট, না ছিল চীনের চেয়ারম্যান না ইদ-মুবারক।

সেকুলারি কবিতা লিখিয়েরা এখন গেরুয়া রং আলতো করে মাখতে চায়! কিন্তু চোখ, কান, নাক, নানান রন্ধ্রগুলিকে সজাগ রাখে। আমার সঙ্গে ইদানীং আবার আলাপ হলো তাদের। সেই কবি-সম্রাট, সেই স্বঘোষিত ছড়াকার, সেই বুদ্ধিজীবীর দল! বললো, কবিতা আজকাল কেউ পড়ে না তেমন, বুঝলে! এবার গা-গর্মি দেশাত্মবোধক কবিতা লিখতে হবে। বললাম, কেন? বললো, কারণ রামনবমী বাড়ছে। দিলুম তাদের 'দেশের মাটি'তে অ্যাড করে। বুদ্ধি খরচ করে হিন্দু হিন্দু কবিতা লেখে, ধমক খেলে তাতে আরবি খেজুরের রস ঢেলে দেয়। আমি হেসে কুল পাইনে। সে এক ধরনের কবিতা বটে— কী যে তার অর্থ জানি না। বললো, দিয়েছি কষে হিন্দুয়ানি! বললাম, কে বললো তোমায় হিন্দুত্ব করতে? এর চেয়ে হিন্দু-বিরোধী কবিতাগুলো তো তবুও ভালো। লিকার চা দিয়ে বেশ খাওয়া যায়। বরং ওসবই লেখো। কথা শুনে খুব গোঁসা হলো কবিয়ালদের। আমাকে বেশ কয়েকটি সাহিত্য সভায় ডেকে নিয়ে, আড়াই তিন ঘণ্টা বসিয়ে, একটা সিঙ্গাড়া খাইয়ে কোনোদিন কবিতা পড়তে ডাকতো, কোনোদিন সে সৌজন্যও থাকতো না। কিন্তু আমি বসে থাকতাম। কবিদের সেকুলারি কবিতার ভোল-বদল দেখতে। আয়োজকরা চায় বাম-মশলা, চুরমুর। এখন কবি কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়ে। আমিও উপস্থিত। একটু গেরুয়া গেরুয়া কালার না হলেও তো চলে না। আবার ধমকেরও ভয়। কবি, সম্রাট, কবি-বাহাদুর পদবিটা না চলে যায়। আমি তাদের বলি, আহা, একটু রোসো। জিরেন-রসটুকু পান করেই জাতীয়তাবাদী হওয়া চলে, চিটেগুড় নয়। তারপর পকেট থেকে স্বরচিত কবিতাখান পড়ে চলে আসি। সে কবিতার নাম 'আরবি-খেজুর', 'দাড়িভিটের দাঁড়ি', 'একুশে নয়, বিষের বিশ', কিংবা 'কালাচ-সাপ'। কবিতা পাঠের এক ঘোর নিঃস্তব্ধতা, দাঁত চেপে কামড়, তারপর ইতিউতি চাহনি, হট্টগোল আর বাইরে বেরিয়ে অজস্র 'সুভাষণ'।

সব শুনেটুনেও, সাহিত্য-বাসর শেষে অনুরোধ করে আসি, আমার কবিতাটি দয়া করে ছেপো। তারপর নানান পত্রিকার নানান সংখ্যা আসে আর যায়, কবিতা ছাপার ডাক আর আসে না। কিন্তু ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টের সংখ্যা বাড়ে, 'কল্যাণ, ফেস-বাসায় আছো?'

'চুপিচুপি কথা বলো/মুখে কিছু বলো না...'।

এবার কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে হবে, কল্যাণকে চাও? না অকল্যাণকে। ❑

ফঃ ৬

নারীমুক্তির দিশারি শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ

উনিশ শতকে সমাজসংস্কার আন্দোলনের নেতৃবর্গ যখন দিশাহারা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সুসামঞ্জস্য করতে অক্ষম, অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে সংকটাপন্ন, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর সুদৃঢ়— সেই সংকটময় মুহূর্তে আচারসর্বস্ব ধর্মের প্রহসন থেকে সমাজকে সুচারুভাবে চালনা করতে ও ঈশ্বরসাধনাকে মানবসেবার প্রাঙ্গণে নামিয়ে আনতে যিনি অগ্রণী ভূমিকায় অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি হলেন যুগদিশারি শ্রীরামকৃষ্ণ। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির 'কল্পবৃক্ষ' আমাদের শিখিয়েছে 'বস্তুতান্ত্রিকতা ও ভোগলোলপুতা' কিন্তু শেখায়নি নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও চিত্ত প্রশান্তির উপায়।

আমাদের বহু শিক্ষা, বহু বৈদগ্ধ্য ও বহু মতবাদের চর্চা সত্ত্বেও আমরা জীবনসমস্যার সমাধান করতে পারিনি, জাতীয় জীবনের সঙ্কটকে অতিক্রম করতে পারিনি, জাতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারিনি। আমরা পাশ্চাত্য দর্শনে খ্যাতিলাভ করি কিন্তু স্বদেশের প্রতি উপেক্ষা দেখাই। তাই আমরা একই দেশে বাস করে দুটো পৃথক জাতিতে পরিণত হয়েছি। উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সেদিন ইংরেজের বাড়ির ঠিকানা যত সহজে রপ্ত করেছিল তত সহজে রপ্ত হতে পারেনি 'মান-হুঁশে'র প্রতিনিধি শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনবার্তা। শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণী ও অশিক্ষিত অসংস্কৃত জনসাধারণের মধ্যে যাতে বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়ে উঠতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই তিনি অনাহূত হয়ে গিয়েছেন শিক্ষিত অভিজাতদের দরজায়। সত্য, ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধের পুষ্প চয়ন করে সহজ সরল পল্লী জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদটুকু বুকে নিয়ে রামকুমারের হাত ধরে গদাধর (১৮৫৪,৩১ মে) এসেছিল মানবাধিকারের পতাকা তুলতে দক্ষিণেশ্বরের সবুজ নিকেতনে। শাস্ত্রের অমানবিক নিষ্ঠুর অনুশাসন উপেক্ষা করে তর্কচুঞ্চু স্বার্থান্বেষী পণ্ডিতদের নির্লজ্জ নিষ্ঠুর বিধান অস্বীকার করে, দরিদ্রের ভগবান অন্ত্যজ শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবীর মন্দিরে স্বয়ং পূজার আসন গ্রহণ করে শূদ্রের অধিকারকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে ভারতের রক্ষণশীল সমাজের উপর চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের নেতা হয়ে ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজের অপাঙক্তেয় অবহেলিতের মাঝে এসে শ্রদ্ধার্ঘ্য অঙ্গীকার করলেন যুগদিশারি শ্রীরামকৃষ্ণ। সমগ্র ভারতে আজ ওই যে শূদ্রাণী (রানি রাসমণি) প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটিকে শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র বলে মেনে নিয়েছে। ভারতবর্ষের রক্ষণশীল সমাজে এর চেয়ে বড়ো মানবস্বীকৃতি আর কোনও সূত্র ধরেই আসেনি যা এসেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য থেকে। তাই তিনি পূজার বেদী থেকে নেমে এসেছিলেন জনসাধারণের মাঝে জীবন্ত দেবতার পূজা করতে ও করার শিক্ষা দিতে।

উনিশ শতকে ব্রাহ্মনেতা থেকে শুরু করে অনেক মহাপণ্ডিত ও সমাজসংস্কারকেরা থিয়েটার দেখা বা থিয়েটারে অভিনয় করাকে অত্যন্ত নিম্নরুচির বলেই মনে করতেন। বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নারীকল্যাণে ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু থিয়েটারে অর্থাৎ রঙ্গালয়ে পতিতারা অভিনয় করবে শুনে তারা রুষ্ট হয়েছিলেন অথচ সেই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণ পতিতাদের দেবতা হয়ে তাদের চৈতন্যময়ীরূপে দেখেছেন। পুরুষশাসিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলি নারীকে বাল্যে পিতার অধীনে, বিয়ের পর স্বামীর অধীনে এবং বৃদ্ধবয়সে পুত্রের অধীনে থাকতে হবে বলে বিধান দিয়েছিল, এমনকী ব্রাহ্মণকন্যাদেরও নারায়ণশিলা স্পর্শের কোনও অধিকার ছিল না। এই সকল মানবতাবিরোধী বিধানের বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণই সর্বপ্রথম পুরুষতান্ত্রিক স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় স্মৃতিশাস্ত্রের শৃঙ্খল থেকে প্রতিটি নারীকে মুক্ত করতে 'মা আনন্দময়ীর' আসনে বসানোর স্থায়ী স্বীকৃতি দিয়ে পুরুষতন্ত্রের একাধিপত্য নির্মূল করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য

জীবনের প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সাদরে আহ্বান জানাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। বারবনিতা থেকে শুরু করে মেথর, ডাকাত, বৃহন্নলা প্রভৃতি ব্রাত্যজনের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন। তিনি একাধিকবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছেন। নাটকে লোকশিক্ষা হয় বলে গিরিশ ঘোষকে নাটক ছাড়তে বারণ করছেন। সেই যুগে মানবতার এমন সব উজ্জ্বলতম যুগদিশারি আর কেউ ছিল না। বিশ্বের মানুষের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। গরিব, অন্ত্যজ, ডাকাত, মাতাল, বেশ্যা, নটী কেউ তাঁর কাছে উপেক্ষা পায়নি, পেয়েছে তাঁর অকুণ্ঠ স্নেহাশীর্বাদ। তত্ত্ববিচারপরায়ণ দার্শনিক বা গজদন্তমিনারবাসী ধনী নয়, তাঁর একান্ত আপনজন ছিল দুঃখী, সরল, সামাজিক পরিচয় প্রতিষ্ঠাহীন, সম্বলশূন্য মানুষেরা। এমনকী তিনি নতুন ধর্ম প্রচার করেননি, কোনো নতুন ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টিও করেননি। সব মানুষের কাছে তাঁর আহ্বান বিবেক, নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের আহ্বান। তাই তিনি নব প্রজন্মকে সচেতন করতে 'কামিনী কাঞ্চন' বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যার অমোঘ প্রভাবে মহান আদর্শও ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, বিপ্লবীরাও হয়ে উঠে বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী।

যন্ত্র সভ্যতার বিকাশ থেকে শুরু করে সকল সভ্যতাই কেবল কাঞ্চনের বন্দনাই করে এসেছে। সব দাসত্বের মধ্যে হীনতম দাসত্ব হলো কাঞ্চনের দাসত্ব। এই দাসত্বের কাছে মানুষ আজ অসহায়, লাঞ্ছিত, পর্যুদস্ত। তাই সেই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত করতেই শ্রীরামকৃষ্ণ ওই দুটি বিষয় থেকে সচেতন হতে বলেছেন। কার্লমার্কসের কথায়, 'টাকার কাছে একজন কুচক্রী, অসৎ, বিবেকবর্জিত নির্বোধও সম্মানিত। উপরন্তু সে বুদ্ধিমান লোকেদের কিনে নিতে পারে এবং বুদ্ধিমানের উপরে যার এমন ক্ষমতা সে কি ওই বুদ্ধিমানদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান নয়? মানুষের হৃদয় যা চায় সব যদি টাকার মাধ্যমে আমি পেতে পারি, তাহলে কি মানুষের (গুণী) যত যোগ্যতা সবই আমার অর্থাৎ টাকার মালিকের (নির্বোধের) হচ্ছে না? আমার টাকা কি আমার অযোগ্যতাকে তার বিপরীতে পরিণত করছে না?' (মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস্ রচনাবলি (ইং), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪)।

সুশীল পাঠক! মার্কসের কথাগুলি কি শ্রীরামকৃষ্ণের কথারই প্রতিধ্বনি নয়? বিদ্বান চিরকাল শক্তিবানের অন্নদাস। ভীষ্ম-দ্রোণাচার্য তাই ছিলেন। কান্ট, হেগেল, লক, বেন্থাম, মিল প্রমুখ বিদ্বানরা এস্টাব্লিশমেন্টকে শক্তিশালী করার কাজে নিযুক্ত থেকেছেন ওই একই কারণে। তাই রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'চাল-কলা বাঁধা বিদ্যা' শিখব না। যে বিদ্যা নিছক ধনার্জনে নিয়োজিত ও সকল বিবেক বর্জিত, সেই বিদ্যার প্রতিই তাঁর অনীহা। মথুরামোহন বিশ্বাস তাঁর জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য একখানা জমিদারি লিখে দিতে চেয়েছিলেন। প্রস্তাব শোনামাত্র তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি তাঁকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন—উভয়েরই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অথচ তিনি তাঁর স্নেহ ঢেলে যাদের আপন করে নিয়েছিলেন তারা কয়েকজন বাউন্ডুলে ছেলে যারা রোজগার করে না। নট-নটী তাঁর সেই স্নেহাশীর্বাদ পেয়েছে যা কপট ধনীরা পাননি। মথুরামোহন তো টাকার থলি খুলে বসেছিলেন চৌদ্দটি বছর। সুতরাং ধন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে কেউ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, আন্তরিকতা ও সরলতাই ছিল তাঁর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য অভিজ্ঞান।

'কামিনী' ত্যাগ মানে কামিনীর প্রতি কোনোরূপ দ্বেষ বা ঘৃণা নয়। যদি তাই হতো তাহলে তিনি কামারপুকুরের এক নিরক্ষরা নিম্নবর্ণীয়া সন্তানহীনা নারী যিনি তাঁর কাছে মা ডাক শুনতে চেয়েছিলেন উপনয়নের সময় তাঁকে দ্বিতীয়া জননীরূপে গ্রহণ করতেন না। তাঁর আরাধ্যা ছিলেন একজন নারী। শ্রীরামকৃষ্ণের 'কামিনী' ত্যাগ মানে নারীর প্রতি দুর্বলতা ত্যাগ। এই দুর্বলতার কারণেই বিপ্লবীদেরও বিবেক চেতনা লুপ্ত হয়, সমাজ ক্রমে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যাহত হয়, পারিবারিক সম্পর্কও বিনষ্ট হয়। তাই তাঁর যুগদিশারির কামিনীর প্রতি আসক্তি ত্যাগের আহ্বান। নারীকে পুরুষ যদি ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখে তাহলে সে সমাজ ক্রমে আরণ্যক সমাজে পরিণত হয়, আবার কোনো নারীও যখন বিবেকশূন্য হয়ে ভোগ লিপ্সাপরায়ণ হয়ে উঠে তখনও সমাজ অধিকতর হীনদশা প্রাপ্ত হয়। তাই অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে ব্রহ্মময়ীরূপে নারী-পুরুষও অভিন্ন। সুতরাং নারী ও পুরুষ উভয়েরই উভয় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার কথাই তিনি বলেছেন। ফ্রয়েডের চোখ দিয়ে নারীকে দেখা নয়, তাঁর নারীকে দেখা মাতৃরূপে, শক্তিরূপে ও ব্রহ্মময়ীরূপে। তাই তিনি তাঁর ইষ্টদেবতা, গুরু, ভিক্ষামাতা এমনকী নিজের স্ত্রী থেকে শুরু করে গর্ভধারিণী, ভবতারিণী, পতিতা সকলের মধ্যেই মা ব্রহ্মময়ীরূপই দেখেছেন। বিশ্বে আজ প্রায় অর্ধেক নারী। তাদের অবজ্ঞা করা, তাদের অধিকারকে অস্বীকার করা প্রগতির চিহ্ন নয়। তাই তিনি নিজ পত্নীকে মাতৃরূপে পূজা করে বিশ্বব্যাপী কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। সেই নারীই আজ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের (রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের) অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হচ্ছেন। নারী প্রগতির এমন চরম স্বীকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কে দিতে পেরেছিলেন সেই শতকে? তার কাছে 'কামিনী ত্যাগ' মানে তার প্রতি ভোগলিপ্সা ত্যাগ।

তিনি পূর্ণাঙ্গ জীবনের অধিকারী ছিলেন বলেই ভালো-মন্দ সকলকেই গ্রহণ করেছেন ও তাদের সঙ্গে মিশেছেন। কামিনী-কাঞ্চনের দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ দেখাতেই তিনি আজ বিশ্বনয়নে যুগদিশারিরূপে প্রতিভাত।

সুতরাং তাঁর চোখে নারী ধর্ম সাধনার বিঘ্ন নয় বা নরকের দ্বারও নয়, পরন্তু নারী স্বয়ং 'মা-ব্রহ্মময়ী', সাক্ষাৎ বিশ্বপ্রসবিনী জগদম্বার জাগৃতি রূপ, ঈশ্বরের জীবন্ত মানবপ্রতিমা ও পুরুষের সমতুল্য মোক্ষসাধনার সমানাধিকারিণী।

একদিকে অন্ধ কুসংস্কার ও জাতপাতের বিরোধিতা, অন্যদিকে সকল ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সমদৃষ্টিরূপ উদার সর্বগ্রাহী মাতৃস্নেহের সমাধানের একমাত্র মহৌষধ। তাই বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অসহিষ্ণুতা নিরসনে, নারীর মর্যাদা রক্ষায় ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজকের পৃথিবীর এই দারুণ দুর্দিনে, ক্রমঘনায়মান অন্ধকারে প্রত্যাসন্ন বিশ্ব মহাযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিশাহারা বিপন্ন মানবতাকে উদ্ধার করতে প্রয়োজন যুগদিশারি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন আদর্শে অবগাহন।

(লেখক : সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কৈলাসহর, ত্রিপুরা)।

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

ইন্দুমতী কাটদরে

শিক্ষার প্রয়োজন

ভারত পরম্পরার দেশ। ভারতে পরম্পরাকে বয়ে নিয়ে যাবার মুখ্য কেন্দ্র দুটো— একটা পরিবার এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিদ্যালয়। পরিবারে চলে বংশ পরম্পরা এবং বিদ্যালয়ে চলে জ্ঞান পরম্পরা। একটিতে পিতা-পুত্র পরম্পরার বাহক, দ্বিতীয়টিতে হচ্ছে গুরু-শিষ্য। এই দুই পরম্পরা থেকে জীবনশৈলী ও জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। হস্তান্তরণের এই কাজ যখন সম্যকরূপে হয়ে থাকে তখন রাষ্ট্রজীবন সমরস, সুখী ও সমৃদ্ধ হয়। পরম্পরা খণ্ডিত হলে রাষ্ট্রজীবনও বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। যখন শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিক থাকে না তখন পরম্পরা খণ্ডিত হয়ে যায়।

শিক্ষা সম্যক না হওয়ার অন্য আরেক স্বরূপও আছে। যখন শিক্ষা ও রাষ্ট্রের জীবন দর্শনের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে তখন রাষ্ট্র জীবন গভীরভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। এমন একটি রাষ্ট্রের উপর রাষ্ট্রের ওপর সাংস্কৃতিক আক্রমণ হয়ে থাকে। ভারতের উদাহরণই আমরা নিতে পারি। ভারতে সপ্তদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধ পর্যন্ত ব্রিটিশদের রাজত্ব ছিল। সেই সময়কালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা ভারতকে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে ইউরোপীয় বানাতে চাইল। তাদের নিজেদের শাসন সুদৃঢ় করাই ছিল উদ্দেশ্য। তারা অনুভব করেছিল যে ভারতের ব্যবস্থায় সমাজ সরকার থেকে স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্ত ছিল। রাজ্য যারই হোক জনসাধারণ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে স্বতন্ত্রই থাকত। জনসমাজকে নিজের অধীন বানাতে তারা শিক্ষাকে ইউরোপিকরণ করল। শিক্ষার ভিত্তিকেই তারা বদলে দিল। তারা ইউরোপের ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, মনোবিজ্ঞান সাহিত্য ইত্যাদি পড়াতে শুরু করল। এটা কেবল জানা ছিল না যে, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান অর্থনীতি ইত্যাদির দৃষ্টিই তারা

বদলেছিল। ভারতে ইউরোপের ইতিহাস-নয় এবং ইউরোপের ইতিহাস দৃষ্টি পড়ানো আরম্ভ হয়ে গেল। এমনটা সব বিষয়ের ক্ষেত্রেই ঘটল।

এটা শুধু বিষয় ও বিষয়বস্তু পর্যন্ত সীমিত থাকল না। তারা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই পালটে দিল। ভারতে শিক্ষা স্বায়ত্ত ছিল। ব্রিটিশরা তাকে শাসনাধীন করে দিল। ভারতে শিক্ষাদৃষ্টিও পালটে গেল। পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার মাধ্যমে জীবনদৃষ্টিতে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। বিগত দশটি প্রজন্ম ধরে পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া চলছে। জীবনদৃষ্টি ও শিক্ষার সম্পর্ক বিচ্ছেদের এই প্রক্রিয়ার পরিণাম খুব ক্ষতিকর হয়েছে। কেবল জগতের কিছু অন্য রাষ্ট্র থেকে ভারতের ভিন্নতা এটাই যে দশটি প্রজন্ম ধরে পরিবর্তনের এই সংঘর্ষ চলছে নিরন্তরভাবে, তবু রাষ্ট্ররূপে ভারত পূর্ণ নষ্ট হয়নি। সময়ে সময়ে ইউরোপীয় জীবনদৃষ্টির নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য রাষ্ট্রীয় শিক্ষার আন্দোলন চলতে থাকল। কিন্তু তা পূর্ণরূপে শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় বানাতে পারেনি। আজও ভারতীয় ও ইউরোপীয় জীবনদৃষ্টির মিশ্রণ শিক্ষার ভিত্তি হয়ে রয়েছে। কেননা শিক্ষার ভিত্তিতে এমন সংমিশ্রণের কারণে রাষ্ট্র জীবনও মিশ্রণ স্বরূপেরই হয়েছে। এর ভীষণ পরিণাম হলো যে আমরা সামাজিক রূপে হীনতাবোধে গ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং ভারতীয় অভারতীয়ের বোধ স্পষ্ট হচ্ছে না। শিক্ষা যখন রাষ্ট্রীয়তার পুষ্টিকারক হয় না তখন রাষ্ট্রের স্থিতি এমনটাই হয়ে যায়। এই জন্য যে কোনো রাষ্ট্রর স্বত্ত্ব বজায় রাখতে হলে ওই রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় হওয়া দরকার। এটা যে শুধু ভারতের জন্যই সত্য এমনটা নয়। বিশ্বের যে কোনো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। আমেরিকায় শিক্ষা হবে আমেরিকান, চীনে হবে চীনা, আফ্রিকায় হবে আফ্রিকান এবং জাপানে হবে জাপানি।

যতদিন কোনো রাষ্ট্রের জীবনদৃষ্টি লোকজীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকে ততদিন রাষ্ট্র জীবিত থাকে। বিশ্বের ইতিহাসে দেখতে পাই যে অনেক রাষ্ট্র যা কোনো এক কালখণ্ডে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে অনেক উচ্চ স্থানে ছিল সে কিছু সময় পরে কালের প্রবাহে লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু ভারত বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের শীর্ষেও ছিল আর এখনও আছে। বিশ্বে ভারত হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন দেশ। এই চিরজীবিতার কারণ ভারতের জীবনদৃষ্টি কখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। আমরা ক্ষীণ হয়েছি কিন্তু প্রাণহীন হইনি। রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে এই চিরজীবীতার মুখ্য কারণ।

আজও রাষ্ট্রের সামনে শিক্ষা রাষ্ট্রীয়করণের মহতী চ্যালেঞ্জ রূপে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এই কাজে লেগে রয়েছে। অনেক সংস্থা এই দৃষ্টিতে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের কাজে লেগে রয়েছে। অনেক সংস্থা জনমানস উজ্জীবনের কাজও করে যাচ্ছে। আজ দেশে শিক্ষার দুটি প্রবাহ চলছে। একটির কাছে অধিকার আছে তো অপরটির মানবজীবনের ওপর প্রভাব রয়েছে। রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসও দেড়শো বছরের পুরাতন। আমাদের আশা পুরুষার্থের মাধ্যমে আমরা যেন শিক্ষাকে পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় রূপে গড়ে তুলি। ভারত বিশ্ব গুরুতে পরিণত হওয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ওই দায়িত্ব পালনের জন্যও শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় করে তুলতেই হবে।

শিক্ষা সমাজনিষ্ঠ হওয়া উচিত

মানুষ সমাজে বাস করে। এক সঙ্গে মানুষের বেঁচে থাকাই সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবন ভৌতিক সমৃদ্ধি, সুরক্ষা ও স্বতন্ত্রতার সঙ্গে যুক্ত হওয়া আবশ্যিক। মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনেক। মানুষের ইচ্ছা

অনন্ত। মানুষ রাগ, দ্বেষ ইত্যাদির কারণে স্বার্থপরও হয়ে থাকে। এই কারণে সুখ শান্তি সুরক্ষা ইত্যাদি সব নষ্ট হয়ে যায়। নিজের কারণে যদি সে বিপদ ডেকে আনে তবে নিজের বুদ্ধির সাহায্যে বিপদ থেকে বাঁচবার উপায়ও খোঁজে। এই মন বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন শাস্ত্র রচনা করেছে এবং নিজের সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল করেছে।

ভৌতিক সমৃদ্ধির জন্য মানুষ অনেক কিছু উৎপাদনের কৌশল শিখেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নির্মাণ, বিতরণ এবং উপভোগ করবার ব্যবস্থা তৈরি করেছে। বস্তুগুলোর নির্মাণে সহায়ক হয় এমন যন্ত্র বানিয়েছে। তারা এই সৃষ্টিকে জানতে চেয়েছে, ভৌত বিজ্ঞানের শাস্ত্র তৈরি হলো। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে সে যন্ত্র ও অন্য উপভোগ্য বস্তু তৈরি করল। বিজ্ঞানকে সে কেবল জিজ্ঞাসার নিরসন পর্যন্ত সীমিত রাখেনি, বরং নিজের ইচ্ছা ও আবশ্যকতা পূরণের মাধ্যমে করে ফেলেছে।

মানুষ পর্যালোচনা করল এবং জীবনকে বোঝার প্রয়াস করল। ওই অভিজ্ঞতাকে ব্যবস্থিত করতে চার পুরষার্থ, চার আশ্রম, চার বর্ণ, অসংখ্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করল এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপিত করতে ধর্মশাস্ত্র তৈরি করল। বাস্তবে ধর্মশাস্ত্রই হচ্ছে সমাজশাস্ত্র যাকে ভারতের মনীষীগণ মানব ধর্মশাস্ত্র বললেন এবং এই ধর্মশাস্ত্রকেই স্মৃতি বললেন। মানব ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা ভারতের মনীষীগণ নিজেদের ভারতের মধ্যে সীমিত রাখলেন না। বরং সম্পূর্ণ বিশ্বকে নিজের প্রয়োগশালায় পরিণত করলেন।

মানব সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ভিত্তি দেবার জন্য তাঁরা পরিবার ব্যবস্থা করলেন। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীকে পতি-পত্নী বানাতে বিবাহসংস্কার এবং বিবাহসংস্থার রচনা করলেন। একাত্মতাকে পরিবার ভাবনার স্বরূপ দিলেন এবং এই পরিবার ভাবনার বিস্তার সম্পূর্ণ বিশ্বকে নিয়ে হোক, এমন উদার অন্তঃকরণকে বিকাশের পর্যায় রূপে তুলে ধরলেন। পরিবার ভাবনাকেই রাজ্যসংস্থা, বাণিজ্যসংস্থা, শিক্ষা শাস্ত্র ও কেন্দ্রীয় তত্ত্বে পরিণত করলেন।

এভাবে তাঁরা অগণিত ব্যবস্থা এবং অগণিত শাস্ত্র তৈরি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অগণিত শাস্ত্র তৈরি করবার জন্য খোলামেলা ব্যবস্থাও রাখলেন।

কালের গতি ও প্রভাব এবং প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতাকে বুঝে তাঁরা সমস্ত ব্যবহার শাস্ত্রকে সম্প্রসারণশীল করে রাখলেন। ভিন্নতাকে স্বাভাবিক ভেবে নিয়ে তাতে বৈচিত্র্য ও সুন্দরতাকে দেখলেন এবং ব্যবহারে সমদৃষ্টিকেই ভিত্তি করলেন, ভিন্নতাকে নয়। দৃশ্যমান ভিন্নতার মাঝে অভ্যন্তরীণ একত্বকে প্রতিপাদন করলেন। এই প্রকারে সমাজকে চিরজীবীতা প্রদান করলেন। সমাজকে চিরজীবী করবার মূল তত্ত্বসমূহ চেনাতেই ভারতের মনীষীগণের বিশেষ লক্ষণরূপে দেখা দিল।

এখানে শাস্ত্র ও ব্যবস্থাবলীর নিরূপণ করবার উদ্দেশ্য নেই। এখানে এটা বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে— এই যে সমাজ ব্যবস্থা তা প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয় ও বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হবার ব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থায় হওয়া দরকার, কেননা শিক্ষা ভিন্ন তার অন্য কোনো মাধ্যম নেই।

(ক্রমশ)

ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত
প্রাক্তন অধ্যাপক

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

পরমেশ্বরণজী চিরদিন স্বয়ংসেবকদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবেন

জে. নন্দকুমার

পরমেশ্বরণজীর বহুমুখী প্রতিভা অল্পকথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর অনুগামীদের কাছে তিনি ছিলেন একজন মৌলিক চিন্তার ধারক, সৃজনশীল লেখক, একজন প্রথম সারির কবি, সুবক্তা এবং সর্বোপরি একজন বড়ো মাপের মানুষ ও আদর্শ স্বয়ংসেবক। তাঁকে 'রাষ্ট্রঋষি' বলা হয়ে থাকে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি পথের দিশারি।

সহজাত কবি পরমেশ্বরণজী সঙ্ঘের জরুরি প্রয়োজনে অবিরতভাবে তার লেখনী দক্ষতায় অন্যান্য চিন্তকদের থেকে ব্যতিক্রমী চরিত্র ছিলেন। এই গুণটির জন্য তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পিতা-মাতার নিকট বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন, যার প্রভাবে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল হিন্দু দর্শন ও সংস্কৃতের প্রতি। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর কাব্যিক দক্ষতাও। তাঁর পিতৃদেব সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন। পরমেশ্বরণজী বি.এ (সাম্মানিক) স্বর্ণপ্রদক প্রাপ্ত হওয়ার পর সঙ্ঘের একজন প্রচারক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর সময়ের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। যেমন, স্বামী অগামানন্দজী, কেরল গান্ধী নামে খ্যাত কে. কেলাপ্পান, মনোহরদেব (ইনি তিরুবনন্তপুরমের প্রচারক ছিলেন যেখানে পরমেশ্বরজী পড়াশুনা করেছেন) এবং পূজনীয় শ্রীগুরুজী, যারা তাঁর চরিত্রিক দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি গড়তে সাহায্য করেছিলেন। আরও স্মরণীয় ঘটনা হলো যে, সাভারকর-সদনে বীর সাভারকরের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের জন্য তিনি দলমত নির্বিশেষে, এমনকী বিপক্ষ শিবিরেও সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেরল রাজ্যের মতো কমিউনিস্ট অধ্যুষিত এবং তাদের সমস্ত রকমের অপপ্রচারের পরিবেশে তাঁর মতো বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের ছাপমারা স্বয়ংসেবকের জন্য এইরূপ স্বীকৃতি আশাতীত। সঙ্ঘ ও সঙ্ঘের কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে সমস্তরকম অপবাদ ও রটনা সত্ত্বেও পরমেশ্বরণজী তাঁর সমকালীন মার্কসবাদী নেতাদেরও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ এবং পি. গোবিন্দ পিল্লাইয়ের মতো বড়ো মাপের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তিনি মার্কসবাদীদের হিংসার পথ পরিহার করতে অনুপ্রাণিত করতেন এবং আবেদন করতেন আদর্শগত বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে রাজ্যে রাজনৈতিক হানাহানি বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হতে।

কলেজে পড়ার সময় আমি কোচিতে সঙ্ঘকার্যালয়ে থাকতাম। সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্ঘপ্রচারকরা প্রায়শই আসতেন। আমার স্মৃতিকোঠায় ধরে রাখা পরমেশ্বরণজীর সঙ্গে একটি ঘটনা প্রায়ই মনে পড়ে। কোচিতে সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যালয়ে থাকাকালীন একদিন শ্রীপরমেশ্বরণজীর ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হাতে ছিল প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কে. দামোদরনের লেখা 'ইন্ডিয়ান থট' বইটি। তিনি আমাকে ডেকে আমার হাতের বইটি দেখতে চাইলেন। একজন ষোলো বছরের ছাত্রের কাছে এটা একটা বিরল ঘটনা যে তাঁর পছন্দের বই একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী প্রচারক দেখতে চাইছেন। আমি তাঁকে বইটি দিলে একঝলক দেখে নিয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আশাকরি তুমি হিন্দু দর্শনের সমস্ত নীতিগুলি জেনে নিয়েছ।' আমি বুঝতে পেরেছিলাম তিনি আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, নিজেদের বিষয়ের মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে গভীর ও সুস্পষ্ট ধারণা করার আগেই পথভ্রষ্ট হয়ে বিকল্প পথ ও ব্যাখ্যার অন্বেষণ যুক্তিযুক্ত নয়। এই রকমভাবে ছোটো ছোটো বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে তিনি আমাদের ত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। পরমেশ্বরণজীর মতো এরূপ প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সাহচর্য পাওয়ার জন্য আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি। সৃজনশীল লেখক হিসেবে পরমেশ্বরণজীর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। কমিউনিস্ট, ইসলামি ও খ্রিস্টানদের সমালোচনার প্রতি প্রবল ঝোঁক, তাঁর মতে এই তিনটিই মুক্ত চিন্তার সমাজ গঠনের প্রধান অন্তরায়। এ সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বী কমিউনিস্টদের সঙ্গে আদর্শগত

সম্মুখসমরকে ছাড়িয়েও তাঁর কেরলের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের গবেষণামূলক বিশ্লেষণ এবং শ্রীনারায়ণগুরু, শ্রীঅরবিন্দের মতো মনীষীদের নিয়ে রচনাশৈলী যথেষ্ট গুরুত্ব-সহ মূল্যায়ন দাবি করে। শ্রীনারায়ণগুরু ও শ্রীঅরবিন্দের জীবনীসংক্রান্ত গবেষণার বিষয়বস্তু গুণমানের বিচারে আজও অতুলনীয় হয়ে আছে। এইসঙ্গে বিবেকানন্দ কেন্দ্র প্রকাশন দ্বারা তাঁর সংগৃহীত রচনা 'হার্ট বিটস অব হিন্দু নেশন' নামে তিনটি খণ্ডের সংকলন যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার।

১৯৫৭ সালে কেরল রাজ্যে জনসঙ্ঘ গঠনের জন্য তাঁকে রাজ্য সংগঠন সম্পাদক রূপে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৮ সালে তিনি জনসঙ্ঘের প্রথম জাতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং পরে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পান। জরুরি অবস্থার সময় তাঁকে দু' বছরের জন্য কারাবাসও ভোগ করতে হয়। এরপর ১৯৭৭ সালে তিনি রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে সমাজ ও তার বিকাশের কাজে নিয়োজিত করেন। চার বছরের জন্য তাঁকে দিল্লিতে দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক রূপে কাজ করতে হয়। ১৯৮২ সালে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে তিনি কেরলে ফিরে আসেন। এবং 'জাতীয় বিচার কেন্দ্রের' মতো এক অমূল্য সংস্থার গোড়াপত্তন করেন। দেশে নতুন ভাবধারা সরবরাহের প্রতিষ্ঠান হিসেবে দিল্লিতে থাকার অভিজ্ঞতা ও দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, যেখানে তিনি প্রথম সঙ্ঘশাখায় যোগদান করেছিলেন সেই তিরুবনন্তপুরমের প্রধান কার্যালয় 'সংস্কৃতিভবন' প্রতিষ্ঠা করেন।

পরমেশ্বরণজী শুধুমাত্র কেরলের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের বা আন্দোলনের পথিকৃৎ শ্রীনারায়ণগুরুর নেতৃত্বে সমাজকে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে পুণ্যভূমিতে উত্তরণের ইতিহাস রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু ইতিহাসকারের ভূমিকা নিয়ে একধাপ এগিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে কেরলের প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধারার পুনরুত্থান ঘটতে সাহায্য করেন। এর ফলে কমিউনিজমের প্রসারের কারণ মহান হিন্দু আন্দোলনের একতার ঐতিহ্যকে বদলে দিয়ে জাতিবিদ্বেষ ও রাজনৈতিক হানাহানির মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি 'বিশাল হিন্দু সম্মেলন'-এর আয়োজন করেন এবং প্রচার শুরু করেন যে 'সব হিন্দু এক'। তিনি হিন্দুসমাজের রীতি হিসেবে মালয়ালম ক্যালেন্ডারের শেষমাস কারকাডাকামকে 'রামায়ণ মাস' রূপে পালন করার এক প্রথা প্রচেলন করেন। ১৯৯৮ সালে এমনই আর একটি প্রস্তাব হলো 'ভগবত গীতা দশক' পালন করতে যাতে কেরলের মানুষের ধর্মস্পৃহা জাগ্রত হয়ে ওঠে।

পরমেশ্বরণজী কেরলের নতুন প্রজন্মকে আসন্ন দুর্দিনের সম্মুখীন হতে হবে বলে ক্রমাগতভাবে সতর্ক করে আসছিলেন। তাঁর মতে, কমিউনিস্টদের সৃষ্টি করা শূন্যতাকে যদি কোনো যথার্থ মতবাদ বা ধারণার দ্বারা পূরণ না করা হয় তবে সেইস্থান 'জঞ্জাল' দ্বারা ভর্তি হয়ে যাবে। কারণ প্রকৃতির নিয়মে কোনো শূন্যস্থান থাকে না। তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন যে, 'কেরল বিনা ভারত অসম্পূর্ণ, অন্যদিকে ভারত বিনা কেরল নিরাপদ থাকবে না'। কেরলের বর্তমান অবস্থা থেকে অনুমান করা যায় আমরা দুর্দিনকে ডেকে নিয়ে আসছি যা আশঙ্কা করে তিনি আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁর এক দৃঢ় উপলব্ধি ছিল যে স্থানীয় বা আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতি তুচ্ছজ্ঞান করে জাতীয় ভাবধারার সংস্থা গঠন করা অসম্ভব। তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব 'ফোর্থ ওয়েভ' শিক্ষিতমহলে শুধু কেরলে নয়, দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

পরমেশ্বরণজীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিভাগুলির মধ্যে সাংবাদিকতা মুখ্যস্থান দখল করে আছে, যদিও সমাজ চিন্তক ও স্বয়ংসেবক হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই অসাধারণ অবদানকে ম্লান করে রেখেছে। গত সত্তর বছর ধরে তিনি একাধিক মালয়ালম পত্রিকা ও ইংরেজি প্রকাশনার সম্পাদনা করেছেন। তিনি মালয়ালম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কেশরী'-র সম্পাদক ছিলেন। নতুন দিল্লির দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দায়িত্বে থাকাকালীন 'মন্থন' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ত্রৈমাসিক মালয়ালম পত্রিকা 'প্রগতি'-র সম্পাদনা তিনি করতেন। মাসিক পত্রিকা 'যুবভারতী' ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বিবেকানন্দ কেন্দ্র পত্রিকা' দুটির তিনি আমৃত্যু প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

একজন প্রকৃত বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে পরমেশ্বরণজী এক বিশাল লেখনী জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি ডজন খানেক মালয়ালম ও ইংরেজি বইয়ের লেখক। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মার্কস অ্যান্ড বিবেকানন্দ : এ কমপ্যারাটিভ স্ট্যাডি', 'শ্রীনারায়ণগুরু', 'ভগবদগীতা : দি নেক্টর অব ইমমরটালিটি' এবং 'হার্ট বিটস্ অব হিন্দু নেশন' ইত্যাদি।

আমার স্মৃতিকোঠায় ধরে রাখা তার সঙ্গে কাটানো আবেগঘন মুহূর্তগুলি আজ প্রকাশ করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। পরমেশ্বরণজীর ছেড়ে যাওয়া শূন্যস্থান কীভাবে ভরাট হবে, আজ এই অপ্রসঙ্গিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাযথভাবেই বলেছেন যে, ' মৃত্যু কখনও জীবনদীপকে নেভায় না, শুধুমাত্র তাকে সরিয়ে রাখে, কারণ ভোর এসেই যাবে।' আমাদের কাছে পরমেশ্বরজী একজন চিরোজ্জ্বল শিখার ন্যায় যা কখনও নিভে যাবে না। তিনি চিরকাল আমাদের পথচলায় দিশা দেখাবেন।

(লেখক 'প্রজ্ঞা প্রবাহের' জাতীয় আহ্বায়ক)

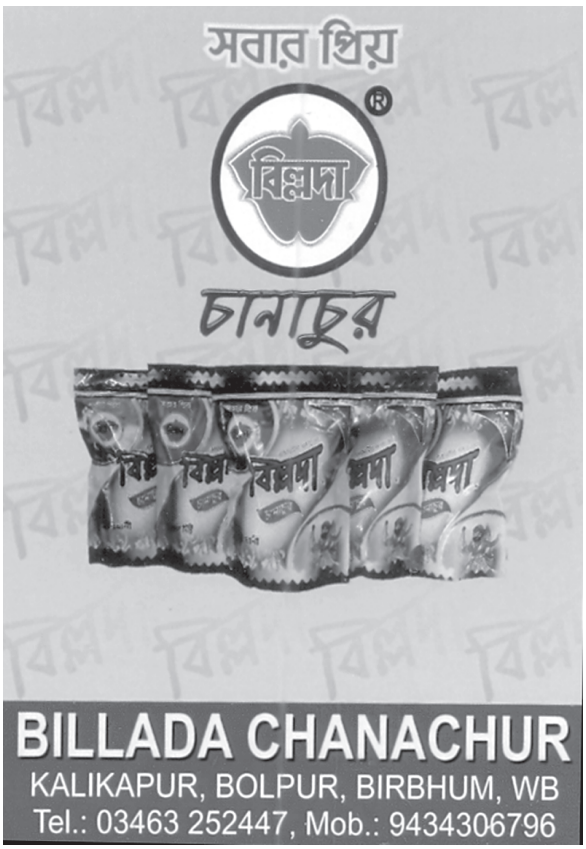

শব্দরূপ-৯ (বিষয় অভিমুখ : প্রাচীনত্ব) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

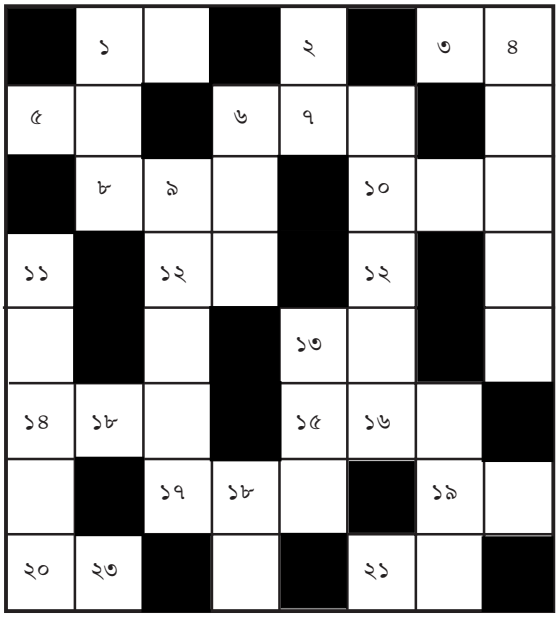

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. তরবারি।
৩. কুচবিহারের প্রাচীন অধিবাসী।
৫. প্রাচীন জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্যের কিংবদন্তী প্রসিদ্ধা পুত্রবধূ।
৬. শিব ও সুন্দরের একাসনে চিরকালীন সত্য।
৮. প্রতিষ্ঠা।
১০. ইউনানি চিকিৎসক।
১২. শূন্য, রিক্ত।
১৩. সকল সময়।
১৪. হর্ষবর্ধনের শাসনাধীন একটি রাজ্য।
১৫. শত্রুতা, কলহ।
১৭. পদ্য।
১৯. শত্রু, শরীর ক্ষেত্রে যার সংখ্যা ছয়।
২০. গলার স্বর
২১. বন্ধুত্ব, মিত্রত।

উপর-নীচ : ১. অবিশ্বাস, উপেক্ষা।
২. দূতের কাজ।
৪. কবিকঙ্কনের কাব্য।
৬. চিহ্নিতকরণ।
৭. আবিষ্কৃত সিন্ধুসভ্যতার অন্যতম নিদর্শন স্থান।
৯. দেশ-বিদেশ পর্যটনকারী ভিক্ষু।
১১. ভক্তিপথের অন্তরায় সমূহ।
১৩. সূর্য।
২৬. বসুধা।
১৮. ভারতের মধ্যবর্তী পর্বতমালা।

(● আগামী সংখ্যায় সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।)

প্রেরণার পাথেয়

আমরা বিভিন্ন শাখায় কাজ করি, কিন্তু স্বয়ংসেবক ভর্তি করার দায়িত্ব সকলেরই। ইহা না ভুলিয়া এবং এই কাজকেই প্রধান কাজ বলিয়া কায়মনোবাক্যে এই কাজে লাগিয়া থাকা স্বয়ংসেবকের কর্তব্য।

* * *

ইহা কোনো আশ্চর্যের কথা নয় যে সঙ্ঘের উপরে একদিকে প্রশংসা ও পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে অথচ অন্যদিকে তাহার বিরোধিতা হইতেছে। কেননা দেখা গিয়াছে যে, সকল ভালো কাজেই এইরূপ বাধা আসিয়া থাকে। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে সাধারণ লোকেও আজ সঙ্ঘের কথা চিন্তা করিতেছে। আজ স্বয়ংসেবকের নিষ্ঠার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া সঙ্ঘ সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ অগ্রগতি করিতে থাকিবে।

* * *

সঙ্ঘের সিদ্ধান্তে অটল শ্রদ্ধা রাখ। সাহস ও আত্মবিশ্বাস সহকারে কাজ কর। আমরা স্বদেশ, স্বধর্ম ও নিজেদের সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য কটিবদ্ধ হইয়াছি। আমাদের অধিষ্ঠান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব কোনোরূপ ভয় কিংবা সংকটে ভীত হইবার কোনও কারণ নাই। বিপদ অকারণে আসে না, উহা পরমাত্মার অসীম কৃপাই সূচিত করে। অগ্নিপরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারি কিনা তাহা দেখার জন্য এবং পরে ভবিষ্যতের পথ আমাদের দেখানোর জন্য ভগবান এইরূপ বিপদের অবতারণা করেন। অতএব এইরূপ মনোভাব লইয়া কাজ কর যে, যেখানে বিপদের পর বিপদ সেখানে অধিকাধিক সঙ্ঘের কাজ হইতে পারিবে।

* * *

কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য সঙ্ঘের কাজ চলিতেছে। সঙ্ঘের কাজ কোনো বিশেষ ব্যক্তির নহে— ইহা সকলের কাজ। ইহা সামূহিক কার্য। এখনও অনেক স্থানে আমাদের কাজ করিতে হইবে। এই কাজের জন্য তরুণ ও বৃদ্ধ সকলেরই আগাইয়া আসা প্রয়োজন। যাঁহারা একথা জিজ্ঞাসা করেন যে সঙ্ঘ আজ পর্যন্ত কী করিয়াছে, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিব যে আপনি নিজে সঙ্ঘের জন্য কী করিতে প্রস্তুত?

* * *

কেবল প্রতিদিন শাখায় উপস্থিত হইলেই সঙ্ঘের প্রতি তোমার কর্তব্য পূর্ণ হইয়া যায় না। আসল কাজ আরম্ভ হয় ইহার পরে। সমগ্র হিন্দুস্থানে সঙ্ঘ শাখার জাল ছড়াইতে হইবে। আমাদের কাজের দিক দিয়া ইহার গুরুত্ব বুঝিয়া লও। এখনও কাজ বাকি আছে— তাহা মনে রাখিয়া দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও। সঙ্ঘ এক অভূতপূর্ব সংগঠন তাহা মনে রাখিও। মহাপুরুষদের কত মহান প্রতিষ্ঠানও অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড কাজ করিয়াছেন। প্রত্যেক স্বয়ংসেবকদের কার্যকুশলতা যদি ঠিক ভাবে কাজে লাগানো যায় তবেই সঙ্ঘের প্রগতি শীঘ্র হইবে এবং এই জীবনে আমরা কাজের সফলতা দেখিয়া যাইতে পারিব।

('ডাক্তারজীর বাণী' পুস্তিকা থেকে গৃহীত)